সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

বিশেষ সপ্তম ই-সংস্করণ, ডিসেম্বর, ২০২০ ■ ৪৮তম বর্ষ

কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে আন্দোলনরত কৃষকদের পাশে গোটা দেশ

কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে আন্দোলনরত কৃষকদের সঙ্গে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের সংঘাত এক চরম জায়গায় পৌঁছে গেছে। প্রায় দেড় মাস ধরে কৃষকরা দিল্লীর সীমান্তে অবস্থান-বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছে। দিল্লির হাড় কাঁপানো শীতের মধ্যে খোলা আকাশের

নিচে রাত কাটানোর ফলে অসুস্থ হয়ে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। অন্যান্য শারীরিক অসুস্থতা এবং বিভিন্ন দুর্ঘটনাতেও বেশ কিছু কৃষক প্রাণ হারিয়েছেন। কিন্তু অমানবিক সরকার কিছুতেই তাঁদের দাবি মানছে না। সরকারের সঙ্গে কৃষকদের বার বার আলোচনা হওয়া সত্ত্বেও কোনো সমাধান সূত্র মিলছে না। কৃষকদের মূল দুটি দাবি হলো—কৃষি আইন বাতিল করতে হবে এবং ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের আইনি স্বীকৃতি দিতে হবে। এই দুটি দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কৃষকরা তাঁদের অবস্থান চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু বৃহৎ পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষাকারী এই স্বৈরাচারী সরকার কোনোমতেই কৃষকদের এই দুটি দাবি মানতে রাজি নয়।

১৪ সেপ্টেম্বর কৃষি বিলগুলি লোকসভায় পেশ হওয়ার সাথে সাথেই দেশব্যাপী কৃষকদের বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কৃষকরা রাস্তায় নামেন। উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা কৃষকদের মিছিলকে রাজধানীতে ঢোকার মুখে পুলিশ আটকে দেয়। দিল্লির যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ দেখায় সারা ভারত কৃষক সংঘর্ষ সমিতি। অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কৃষকরা মিছিল ও বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করেন।

পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় বিভিন্ন জায়গায় কৃষক সংগঠনগুলি একসঙ্গে প্রতিবাদ সভা করে। কলকাতায় মৌলালির মোড়ে সারা ভারত কৃষক সংঘর্ষ সমন্বয় কমিটির পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষ থেকে একটি বিক্ষোভ সভা করা হয়। কৃষক স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে লোকসভায় কৃষি সংক্রান্ত তিনটি বিল পাশ করিয়ে নেওয়ায় ফুঁসতে থাকে গোটা দেশ। কর্পোরেট স্বার্থবাহী আইন তৈরির অপচেষ্টায় অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে রাজ্যে রাজ্যে।

২০ সেপ্টেম্বর বিরোধীদের তুমুল প্রতিবাদের মধ্যেই রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকা সত্ত্বেও দুটি কৃষি বিল কার্যত গায়ের জোরেই পাশ করিয়ে নেয় সরকার। এরপর আর প্রতিবাদ নয়, সরাসরি প্রতিরোধের প্রস্তুতি নেয় কৃষক সংগঠনগুলি। ২০ সেপ্টেম্বর বেলা বারোটা থেকে তিনটে পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার অধিকাংশ জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়। ২১ সেপ্টেম্বর রাজস্থানের ২৪৭টি মান্ডিতে একদিনের ধর্মঘট করা হয়। ওই দিন প্রতিবাদে সরব হয় দিল্লি, চেন্নাই, বেঙ্গালুরুও। উত্তরপ্রদেশ ও ওড়িশায় কৃষকরাও প্রতিবাদে সোচ্চার হন। সংসদের মধ্যে বিরোধী কণ্ঠস্বরকে দমন করা, জবরদস্তি বিল পাশ করানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে আরও এক ধাপ এগিয়ে ২২ সেপ্টেম্বর সংসদ অধিবেশনই বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয় অধিকাংশ বিরোধী দল।

সংসদে কৃষি বিল পাশের বিরুদ্ধে ২৫ সেপ্টেম্বর 'সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস'-এর ডাক দেয় সারা ভারত কিষাণ সংঘর্ষ সমন্বয় কমিটি। ওই দিন কৃষি বিলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ-অসন্তোষ জোরালো বিক্ষোভের আকারে রাস্তায় নেমে আসে। দেশের ২০০টিরও বেশি কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনকে নিয়ে তৈরি ওই সমন্বয় কমিটির আহ্বানে দেশব্যাপী প্রতিরোধ দিবসে উত্তাল হয় একের পর এক রাজ্য। পাঞ্জাব, হরিয়ানায় সর্বাত্মক বন্‌ধ, কর্ণাটকে বন্‌ধের চেহারা, উত্তর ভারতজুড়ে রাস্তা অবরোধ, পশ্চিমবঙ্গে দুশোর বেশি জায়গায় অবরোধের ঢেউ ওঠে। সবুজ বিপ্লবের রাজ্য পাঞ্জাবে রাজ্যের কৃষক সংঘর্ষ সমিতির ডাকে আগের দিন থেকেই শুরু হয়ে যায় তিন দিনের রেল অবরোধ। কোথাও কোথাও প্রধানমন্ত্রীর কুশপুতুল পোড়ানো হয়, কোথাও আবার ট্র্যাক্টর পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখান কৃষকরা। উত্তরপ্রদেশেও আংশিক বন্‌ধ পালিত হয়। উত্তরপ্রদেশ-দিল্লি সীমান্তে চিল্লার কাছে এসে সমবেত হন কৃষকরা। দিল্লিতে যাতে ঢুকতে না পারে তার জন্য বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। দিল্লি-নয়ডা সড়ক অবরোধ হয়ে থাকে তিন ঘণ্টা ধরে। দিল্লি-মিরাট সড়কও বন্ধ হয়ে যায়।

বিহারের রাজধানী পাটনায় রাস্তা অবরোধ করেন কৃষকরা। তাঁদের

লড়াইতে শামিল ছিলেন বিরোধী রাজনৈতিক নেতারাও। রাজস্থানের বিভিন্ন জায়গায় কোথাও তহসিল কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ হয়, কোথাও আবার কৃষকরা রাস্তায় বসে পড়েন। বামপন্থী ও সহযোগী দলগুলির সাথে সাথে ছাত্র, যুব, মহিলা সংগঠনগুলিও এই বিক্ষোভে অংশ নেয়। লক্ষণীয়ভাবে দলিত ও আদিবাসীদের সংগঠনও এই কর্মসূচীতে শামিল হয়। মহারাষ্ট্রে সারা ভারত কৃষক সভার নেতৃত্বে ৫০ হাজারেরও বেশি কৃষক রাজ্যের ২১টি জেলায় বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা কৃষি বিলের কপি পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখান। ছাত্র, যুব, মহিলারাও দলে দলে বিক্ষোভে শামিল হন। অনেক জায়গায় রাস্তা রোকো কর্মসূচি পালিত হয়। রাজ্যের প্রধান সড়কগুলির প্রায় সর্বত্রই অবরোধ চলে। সি আই টি ইউ ও অন্যান্য গণ সংগঠনগুলি ছাড়াও এন সি পি এবং শিবসেনা কর্মীরাও অনেক জায়গায় প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। কর্ণাটক ওইদিন বন্‌ধের চেহারা নিয়েছিল। রাজ্যের বহু জায়গায় সড়ক অবরোধ হয়। গোটা কেরালা ওই দিন প্রতিবাদে মুখর হয়ে

ওঠে। ২৫০টি কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তরের সামনে ধরনা-বিক্ষোভ হয়। তামিলনাড়ুতেও প্রতিবাদ ব্যাপক আকার নেয়। কৃষকরা রাস্তা অবরোধ করেন বহু জায়গায়। ওই রাজ্যের পুলিশ অবরোধ তুলতে শক্তিপ্রয়োগ করে। তেলেঙ্গানার বিভিন্ন জায়গায় উত্তাল বিক্ষোভ হয়। হায়দ্রাবাদেও বড়ো প্রতিবাদ কর্মসূচি করে কৃষক-শ্রমিক ও অন্যান্য গণ সংগঠনগুলি। ঝাড়খণ্ডে রাঁচি সহ বিভিন্ন জায়গায় কৃষকরা অবরোধে শামিল হন। উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, জম্মু-কাশ্মীর ও ছত্তিশগড়ে হাজার হাজার কৃষক বিক্ষোভে শামিল হন। ত্রিপুরাতেও

বড়ো আকারের বিক্ষোভ হয়। দিল্লির যন্তর মন্তরে কৃষক সংঘর্ষ সমিতি ও অন্যান্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সমবেত হয়ে বিক্ষোভ দেখান। পশ্চিমবঙ্গে ১৬টি বামপন্থী ও সহযোগী দলও ওইদিন কৃষক সংগঠনগুলির সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিবাদ আন্দোলনে শামিল হয়। শ্রমিক, কর্মচারী, মহিলা, শিক্ষক ও ছাত্র-যুব সংগঠনগুলিও কৃষকদের আন্দোলনের সমর্থনে বিভিন্ন কর্মসূচী নেয়।

তুমুল কৃষক বিক্ষোভের চাপে ভাঙন ধরে কেন্দ্রের শাসক জোটে। কৃষি বিলের প্রতিবাদে এন ডি এ থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেয় জোটের সবচেয়ে পুরোনো শরিক শিরোমণি আকালি দল। কৃষি বিলের প্রতিবাদে আগেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন আকালি দলের একমাত্র মন্ত্রী হরসিমরাত কাউর বাদল। ২৫ সেপ্টেম্বর কৃষক বিক্ষোভে তিনি এবং তাঁর স্বামী আকালি দলের নেতা সুখবীর সিং বাদলও অংশগ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় সরকার পিছু না হটায় দেশজুড়ে উত্তাল কৃষক আন্দোলন চলতেই থাকে। ক্রমশ তা প্রসারিত হয় বিভিন্ন রাজ্যে, গ্রামে গ্রামান্তরে। পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় অবরোধ চলতেই থাকে ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। কিষাণ মজদুর সংঘর্ষ সমিতি জানিয়ে দেয় যে কেন্দ্রের কালা বিল বাতিল না হওয়া পর্যন্ত কৃষক আন্দোলন চলতেই থাকবে। তাঁরা বলেন যে কৃষি বিল কার্যত কর্পোরেটের কাছে কৃষকদের

দাসত্বের পরোয়ানা—তাই নিরন্তর প্রতিরোধ চলবে। কৃষকদের লাগাতার বিক্ষোভ আন্দোলনকে স্বাগত জানায় বিভিন্ন কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন। ২৯ সেপ্টেম্বর সারা ভারত কৃষক সংঘর্ষ সমিতির নেতৃবৃন্দ বৈঠকে বসে রাজ্য স্তরের আন্দোলন ছাড়াও সর্বভারতীয় প্রতিবাদের রূপরেখা ঠিক করেন। আন্দোলনের শীর্ষে ২৬-২৭ নভেম্বর 'দিল্লি চলো' অভিযান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাধ্য হয়েই সরকারের তরফে কৃষি মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমার কৃষকদের ২৯টি সংগঠনকে আলোচনায় ডাকেন ১৪ অক্টোবর। কিন্তু বৈঠকের আহ্বায়ক হওয়া সত্ত্বেও কৃষি মন্ত্রী নিজেই হাজির না থাকায় কৃষক নেতৃত্ব বৈঠক প্রত্যাখ্যান করেন। আকালি দলের পথেই কৃষকদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে এন ডি এ শিবির থেকে বেরিয়ে আসে রাষ্ট্রীয় লোকতান্ত্রিক পার্টি (আর এল পি)।

উত্তর ভারতে এ বছর দশেরা পালিত হয় এক অভিনব কায়দায়। উত্তর ভারতের জনগণের কাছে দশেরা হলো অশুভ শক্তির বিনাশকারী এক উৎসব। এই উৎসবে তাঁরা অশুভ শক্তির প্রতীক হিসেবে রাবণের

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

সম্পাদকীয়

অন্নদাতারা এখন আমাদের শিক্ষকও

এক মাসেরও বেশি সময় ধরে, একটানা, লক্ষাধিক কৃষক রাজধানী দিল্লিকে ঘিরে অবস্থান করছেন। দিল্লি সংলগ্ন রাজ্যগুলি থেকে হাজার হাজার কৃষক রাজধানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিলেন গত ২৫ নভেম্বর। তার ঠিক পরের দিনটিই ছিল শ্রমিক-কর্মচারীদের ডাকা দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের দিন। যে সাত দফা দাবি নিয়ে ঐ ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল, তার অন্যতম দাবি ছিল তিনটি নয়া কৃষি আইন, যা সংসদে বিরোধীদের কোনোরকম আলোচনার সুযোগ না দিয়ে, কার্যত জোর জবরদস্তি পাশ করানো হয়েছিল, তা বাতিলের দাবি। তাদের দাবিকে নিয়ে দেশজুড়ে প্রচার করছে শ্রমিক-কর্মচারীরা এই বার্তা দিল্লি অভিমুখে পথ হাঁটা কৃষকদের নিশ্চিতভাবে অনেক বেশি প্রত্যয়ী করে তুলেছিল। কৃষকরাও কিন্তু তাদের শ্রমিক-কর্মচারী ভাইদের লড়াই থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকেনি। তারাও ২৬ নভেম্বর গ্রাম ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ দেখিয়েছে, এমনকি কোথাও কোথাও গ্রামীণ অর্থনীতির চাকাটাকে একদিনের জন্য থামিয়ে রেখে শহর ও শহরতলীর সাথে সাথে গ্রামকেও সাধারণ ধর্মঘটের বৃত্তের মধ্যে টেনে এনেছে। আবার উল্টোদিকের ছবিটাও একই রকম উজ্জ্বল। কৃষকের দাবি নিয়ে শ্রমিক-কর্মচারীরা শুধু ২৬ নভেম্বরের ধর্মঘটেই যায়নি, দিল্লির প্রায় সবক'টি প্রবেশ পথ অবরুদ্ধ করে লক্ষাধিক কৃষকের অবস্থান-বিক্ষোভ কর্মসূচী শুরু হওয়ার পর থেকে প্রত্যেক দিন দেশের কোনো না কোনো অংশে বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে দুর্বার কৃষক আন্দোলনের প্রতি তাদের পূর্ণ সংহতি জানিয়েছে। নিজস্ব দাবির পাশাপাশি একে অপরের দাবি নিয়ে সোচ্চার হওয়ার এই প্রক্রিয়া, শহুরে মেহনতী ও গ্রামের মেহনতীর মধ্যে এক অভূতপূর্ব ঐক্যের বীজ বপন করেছে। ঘনীভূত অর্থনৈতিক সঙ্কটের জমিতে, অভিজ্ঞতার জল আর রাজনৈতিক চেতনার সার প্রয়োগ করে এবং বিভেদকামী সবরকমের দুর্যোগ থেকে বাঁচিয়ে যদি এই অঙ্কুরিত ঐক্যের সঠিক পরিচর্যা করা যায়, তাহলে সময়ের সাথে সাথে ফুলে-ফলে পল্লবিত ঐক্যের মহীরূহ মাথা তুলে দাঁড়াবেই।

দেশব্যাপী শ্রমিক-কৃষকের পারস্পরিক সংহতি যাকে আমরা আন্তঃশ্রমজীবী ঐক্য বলত পারি, তার পাশাপাশি, স্বাধীনতা উত্তরপর্বে সর্ববৃহৎ কৃষক আন্দোলনের অপর বৈশিষ্টটি হল, কৃষক সমাজের অভ্যন্তরীণ ঐক্য। আমরা জানি কৃষক সমাজ বলতে কোনো সমস্বত্ত্ব বা হোমোজিনিয়াস চরিত্রের শ্রেণীকে বোঝায় না। এই সমাজের মধ্যে যেমন ধনী, মাঝারি ও দরিদ্র কৃষক রয়েছে, তেমনই রয়েছে ভূমিহীন ক্ষেতমজুর বা কৃষি শ্রমিক। উৎপাদনের চরিত্র অনুযায়ী এরা কৃষক সমাজের অন্তর্ভুক্ত হলেও, উৎপাদন সম্পর্কের নিরিখে এরা কার্যত শ্রমিক। স্বভাবতই কৃষক সমাজের অভ্যন্তরে এই স্তরভেদের কারণে স্বার্থের বিভিন্নতা থাকে। দরিদ্র কৃষক, যারা ক্ষুদ্র জোতের মালিক, তারা ফসলের উপকরণ সংগ্রহ বা উৎপাদিত ফসল বাজারজাত করার জন্য ধনী কৃষকের ওপর বহুলাংশেই নির্ভরশীল। আবার কৃষি শ্রমিকদের মজুরির হ্রাস-বৃদ্ধি, এ সংক্রান্ত সরকারী নির্দেশিকা থাকলেও ধনী কৃষকরাই তা নিয়ন্ত্রণ করে। বর্তমান পর্বের কৃষক আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, উল্লিখিত স্তরভেদগুলি ঘুচে কৃষক সমাজকে এক আপাত হোমোজিনিয়াস চরিত্র প্রদান করেছে। কৃষক সমাজের মধ্যেই যে স্বার্থের বিভিন্নতা রয়েছে, আর্থিক অবস্থার বিপুল পার্থক্য রয়েছে—এটা শাসকশ্রেণী বোঝে বলেই, শুরু থেকেই দিল্লিকেন্দ্রীক কৃষক আন্দোলনকে ধনী কৃষকদের আন্দোলন বলে দেগে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও ঘটনা হলো, ধনী কৃষক থেকে শুরু করে কৃষি শ্রমিক বা ক্ষেতমজুর সকলেই বিপুল সংখ্যায় এই আন্দোলনে শামিল হয়েছে। আমাদের দেশে কৃষিজীবীদের ৮৬ শতাংশের হাতে ক্ষুদ্র জোতের মালিকানা রয়েছে। এই অংশ আন্দোলন থেকে সরে থাকলে দিল্লি শহরের প্রত্যেকটি প্রবেশ পথে বিপুল সংখ্যক কৃষকের উপস্থিতি সম্ভব হতো না।

এই আন্দোলনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল, বয়স-ধর্ম-লিঙ্গ নির্বিশেষে কৃষক পরিবারের সকল সদস্যের অংশগ্রহণ। কোনো একটি পরিবারের শুধুমাত্র নবীন সদস্য বেরিয়ে এসে আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন, আর অন্যান্যরা নিজ নিজ রাজ্যে পরিবারের মধ্যেই রয়েছেন, তেমনটা না। কার্যত গোটা পরিবার দীর্ঘমেয়াদি লড়াইয়ের যাবতীয় প্রস্তুতি নিয়ে উঠে এসেছে রাজধানী সীমান্তে। আন্দোলনের চরিত্রের এই সর্বজনীনতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, যা সচরাচর সব আন্দোলনে চোখে পড়ে না। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি বিরোধী বহু আন্দোলনের অভিমুখ হয় দিল্লি। 'দিল্লি চলো', 'সংসদ অভিযান' প্রভৃতি আহ্বানে শ্রমজীবীদের ব্যাপক জমায়েতও দিল্লি শহর কম দেখেনি। কিন্তু যতক্ষণ না সরকার আমাদের দাবি মানছে, ততক্ষণ আমরা নড়ব না। দিল্লিতে যদি ঢুকতে নাও দেয়, তাহলেও যেখানে আটকাবে সেখানেই বসে থাকব, প্রবল শৈত্য প্রবাহের মধ্যে আকাশ ভাঙা বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে, অস্থায়ী ছাউনির নিচে অস্থায়ী সংসার পেতে—না, এমন হার না মানা জেদ, আমাদের দেশের স্বাধীনতা-উত্তর গণ আন্দোলনের ইতিহাসে বিরল। সময়ের সাথে সাথে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা এবং তাদের উদ্দীপনায় ভাটার টান অনুভূত হওয়া একটি স্বাভাবিক প্রবণতা। কিন্তু এই আন্দোলনের ক্ষেত্রে মাসাধিককাল অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও, অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা তো কমেই নি, বরং ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। উদ্দীপনারও যে কোনো ঘাটতি নেই, তার প্রমাণ শীত ও বৃষ্টির জোড়া আক্রমণকে ঠেকানোর জন্য ত্রিপল আর প্লাস্টিকের পরিবর্তে ইটের ওপর ইট সাজিয়ে কংক্রিটের দেওয়াল তুলে মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চতুর্থ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যটি হল, এই আন্দোলনের 'প্যান-ইন্ডিয়া' চরিত্র। যদিও শুরু থেকেই একটা প্রচার ছিল যে, শুধুমাত্র পাঞ্জাব ও হরিয়ানার কৃষকরা এই আন্দোলনে অংশ নিচ্ছে। কিন্তু সুদূর মহারাষ্ট্র থেকে কয়েক হাজার কৃষক এই আন্দোলনে একযোগে অংশ নিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে, যা বলা হচ্ছিল তা অপপ্রচারই। অতিমারি পরিস্থিতি না থাকলে আরও বহু রাজ্যের কৃষকই যে এই আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশ নিত, তা বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য ভিত্তিক কৃষক সংগঠনগুলির বক্তব্য থেকে পরিষ্কার। তবে দিল্লী পৌঁছোতে না পারলেও, নিজ নিজ রাজ্যে কৃষি আইন বাতিলের দাবিকে সমর্থন করে সংহতিমূলক কর্মসূচীগুলিতে যেভাবে বিপুল সংখ্যায় কৃষকরা অংশ নিচ্ছে, তাতে প্রমাণিত হয়, তাদের শরীরগুলো দিল্লি পৌঁছোতে না পারলেও, দিল্লিতে অবস্থানকারী কৃষকদের সাথে তারা মানসিকভাবে সম্পূর্ণ একাত্ত হয়ে পড়েছে। ৮ ডিসেম্বর, কৃষক সংঘর্ষ সমন্বয় কমিটির ডাকা ভারত বন্ধের দিনে, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী গ্রাম ভারত যেভাবে সাড়া দিয়েছে, তাতেই একথা প্রমাণিত হয়। পঞ্চম তাৎপর্যবাহী বৈশিষ্ট্যটির আলোচনা, একটি প্রশ্ন দিয়ে শুরু করা যেতে পারে। প্রশ্নটি হল, এই আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত, নাকি কোনো একটি কেন্দ্র থেকে পরিচালিত সংগঠিত আন্দোলন? এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা বৃথা। কারণ সেই উত্তর ভুল হতে বাধ্য। আসলে এই আন্দোলনে রয়েছে স্বতঃস্ফূর্ততা ও সংগঠিত প্রয়াসের এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ। এভাবেও বলা চলে, প্রবল স্বতঃস্ফূর্ততাকেও স্ব-আরোপিত শৃঙ্খলার লক্ষণরেখা দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। তাই একদিকে মুহুর্মুহু স্লোগান চলছে, গণচুলা ও গণ রসুইয়ে তারা শুধু নিজেদের খাবারের বন্দোবস্তই করছে না, পথচলতি মানুষের দিকেও খাবারের থালা এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অথচ এই স্বতঃস্ফূর্ততাই কখনও বাঁধন ছাড়া হয়নি। পুলিশের লাঠি, টিয়ার গ্যাস, জলকামান, রাস্তা কেটে আর কাঁটাতার দিয়ে দেশের নাগরিকদের দেশেরই রাজধানীতে ঢুকতে না দেওয়ার মতো সংবিধান বিরোধী কাজই করেছে পুলিশ প্রশাসন কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে, কিন্তু লক্ষ কৃষকের মধ্যে একজন কৃষকও উত্তেজিত হয়ে পাল্টা একটুকরো ইটও ছোঁড়েনি। মহাত্মা গান্ধী যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে অহিংস আন্দোলনের এই রূপ নিশ্চিতভাবেই তাঁকে আনন্দ দিত।

স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন ক্রমান্বয়ে তার পরিধির বিস্তার ঘটায়। নতুন নতুন সংগঠন, নতুন অংশের মানুষ এসে যুক্ত হয়। কখনও সূচনালগ্নে কেন্দ্রীয় দাবি বা দাবিগুলিকেই সমর্থন করে, আবার কখনও সমধর্মী নতুন দাবিকে বহন করে এনে। নিকট অতীতে 'আরব বসন্ত' বা 'অকুপাই ওয়ালস্ট্রীট' আন্দোলনে এর প্রতিফলন আমরা দেখেছি। বর্তমান কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি, দুই শতাধিক সংগঠনের যৌথ মঞ্চ 'কিষাণ সংঘর্ষ সমন্বয় কমিটি' যদি এই আন্দোলনের মূল কাণ্ড হয়, তাহলে সেই কাণ্ডকে ঘিরে আরও প্রায় ৩০০টি সংগঠনের ডালপালা, আন্দোলনের এক সুবিশাল মহীরূহ তৈরি করেছে। এতগুলি সংগঠন একযোগে চারটি দাবি সরকারের কাছে উত্থাপন করেছে [তিনটি কৃষি আইন আর বিদ্যুৎ আইন (সংশোধনী) বিল বাতিল করার দাবি]। স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্যে স্ব-আরোপিত শৃঙ্খলা হল, পাঁচ শতাধিক সংগঠনের কোনো একটি সংগঠনও এই চারটি দাবির বাইরে কোনো একটি দাবিও একদিনের জন্যও উত্থাপন করেনি। শুরু থেকেই এই আন্দোলনের কাছে পাখির চোখ হল, তিনটি কৃষি আইনকে বাতিল করতে সরকারকে বাধ্য করা। দিল্লি কেন্দ্রীক আন্দোলনের যে স্বতঃস্ফূর্ততা, তা একটি ফুলদানিতে সাজানো রঙবাহারি ফুলের মতো। এর ফুলদানিটি হল, জুন মাসে কৃষি সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স জারি হওয়া এবং সেপ্টেম্বরে সংসদে আইন পাশ হওয়ার আগে ও পরে পাঞ্জাব, হরিয়ানা সহ বিভিন্ন রাজ্যে ধারাবাহিক বিক্ষোভ আন্দোলন। বিকেন্দ্রীভূত আন্দোলনগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে, তাকে কেন্দ্রীভূত করে স্বতঃস্ফূর্ততার মাত্রা বজায় রেখে ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা করা, এক অনুপম বৈশিষ্ট্য। এ যেন সংগঠিত আন্দোলনের এক আলগা কাঠামোর মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে ধারণ করা।

যখন কোনো আন্দোলনের সাগরে বহু ধারা এসে মেশে, তখন বিভিন্ন ধরনের অসত্য ও অপপ্রচারের বাঁধ দিয়ে সেই ধারাগুলির মধ্যে বিভাজিকা সৃষ্টি করে, আন্দোলনের সম্মিলিত ঢেউ-এর শক্তিকে দুর্বল করা শাসকশ্রেণীর পুরোনো কৌশল। আমাদের দেশেও প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে, যখন অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফৎ আন্দোলনের ধারা দুটির সমন্বয় ঘটছিল, ঠিক তখনই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসক এবং উভয় ধর্মের মৌলবাদীরা ধর্মীয় পরিচিতির ওপর ভিত্তি করে দ্বি-জাতি তত্ত্ব উত্থাপন করে। বর্তমান আন্দোলনের পর্বেও সেই পুরোনো অস্ত্রের প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে একাধিকবার। পাঞ্জাবের কৃষক সংগঠনগুলি যেহেতু অন্যতম নেতৃত্বদায়ী শক্তি, তাই শুরুতে বলা হল এই আন্দোলন খালিস্তানিদের দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু তাতে যখন কাজ হল না, তখন বলা হল সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের স্বার্থে এই আন্দোলনকে পেছন থেকে মদত দিচ্ছে। অথচ কোনো রাজনৈতিক দলকেই আন্দোলনের ত্রিসীমানায় কৃষকরা পৌঁছোতেই দেয়নি। ফলে এই অপপ্রচারও মাঠে মারা গেল। তারপরে এল 'মাওবাদী' প্রসঙ্গ। এই কৃষক আন্দোলন মাওবাদীদের ব্রেইন চাইল্ড, একথা শুনে সাধারণ মানুষ তো বটেই, এমনকি ঘোড়াও হেসে ফেললো। কারণ আমাদের দেশে মাওবাদী আন্দোলন মানে, রাতের অন্ধকারে ঘন জঙ্গল থেকে অতর্কিত আক্রমণ ও খুন-সন্ত্রাস-লুঠতরাজ ও রাহাজানির রাজনীতি। প্রকাশ্য দিবালোকে রাজধানীর সন্নিকটে, নিজেদের পকেটের পয়সা খরচ করে তেজোদ্দীপ্ত অথচ সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ আন্দোলন পরিচালনার কোনো নিদর্শন এদেশীয় মাওবাদীদের 'তথাকথিত বিপ্লবী' কর্মকাণ্ডে নেই। কিন্তু সব থেকে বড় কথা হল, এত অপপ্রচার সত্ত্বেও আন্তঃকৃষক সংহতি এতটুকুও টলল না। বিভাজিকা তৈরির চেষ্টা মুখ থুবড়ে পড়ল।

সপ্তম বৈশিষ্ট্য হল, নয়া কৃষি আইন আসলে কাদের এজেন্ডা তা কৃষকরা ধরে ফেলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার শুধুমাত্র শিখণ্ডী, পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ছে কর্পোরেট পুঁজি—এই উপলব্ধি নরেন্দ্র মোদির 'আত্ম-নির্ভর' ভারতের মুখোশটাকে টেনে ছিঁড়ে দিয়েছে। অক্যুপাই ওয়ালস্ট্রীট আন্দোলনও আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে 'আমরা ৯৯ শতাংশ'—এই স্লোগান তুলেছিল। ঐ স্লোগানের মধ্যেই লগ্নীপুঁজির সহায়ক শক্তি মার্কিন সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ছিল। কিন্তু বর্তমান পর্যায়ের কৃষক আন্দোলন যেভাবে একই সাথে 'আত্মনির্ভর ভারত' নামক নাটকটির পরিচালক (আদানি, আম্বানি) এবং কুশীলব (বি জে পি সরকার)-এর বিরুদ্ধে কর্মসূচী গ্রহণ করছে, তা অনেকটাই নজিরবিহীন।

সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য, আন্দোলনের ডিটারমিনেশন বা হার না মানা মনোভাব। মোদী সরকার বার বার আলোচনার নামে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। আন্দোলন চলাকালীন অর্ধ শতাধিক সাথী শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন। প্রবল ঠাণ্ডা আর বৃষ্টিতে ভিজে শরীর দুর্বল হয়েছে, কিন্তু মনোবলে এতটুকু চিড় ধরেনি। এবং মনোবল আগামীদিন গুলোতেও অটুট থাকবে, এই চূড়ান্ত আত্মবিশ্বাস থেকে এক গুচ্ছ আগাম কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছে। গণ আন্দোলন সাধারণভাবে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে চূড়ান্ত পর্বে উন্নীত হয়। চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছানোর পর কতটুকু সাফল্য অর্জিত হল, তা মূল্যায়ন করে আবার নিচ তলা থেকে সংগ্রাম আন্দোলন গড়ে ওঠে। আমাদের দেশেই যেমন ৮ জানুয়ারি ২০২০-র সাধারণ ধর্মঘট ছিল চূড়ান্ত পর্ব। তা কেন্দ্রীয় নীতি পরিবর্তনে সমর্থ হয়নি বলে, আবার নিচ থেকে আন্দোলন গড়ে তুলে ২৬ নভেম্বর, ২০২০ সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল। এই উপর্যপুরি আন্দোলনেও এক ইঞ্চিও জমি না ছাড়ার ডিটারমিনেশন রয়েছে। কিন্তু এর প্রয়োগ কৌশল হল—বার বার ধাক্কা দাও। কিন্তু একবার জোর ধাক্কা দিয়ে সরে না গিয়ে চাপটাকে বজায় রাখতে হবে, এক মুহূর্তের জন্যও শিথিল করা যাবে না—অস্বীকার করার উপায় নেই, আন্দোলনের এ এক নতুন পাঠ, যার রচয়িতা আমাদের অন্নদাতারা।

আমরা সেলাম জানাই আমাদের অন্নদাতাদের, কারণ শিক্ষকের মতোই স্বৈরতান্ত্রিক শাসনকে ব্যাকফুটে ঠেলে দেওয়ার মতো সংগ্রামের যে নয়া ব্যাকরণ, তার পাঠ তারা আমাদের দিচ্ছে প্রতিদিনই। □

১৫ জানুয়ারি, ২০২১

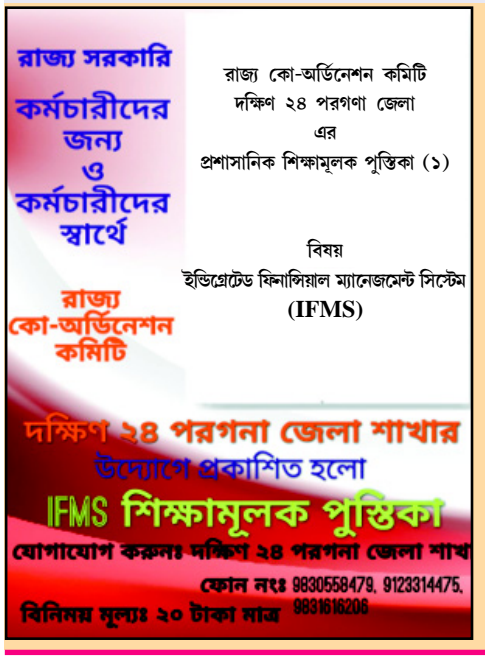

প্রশাসনিক শিক্ষামূলক পুস্তিকা

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে আমাদের এই সমাজে উৎপাদনের জন্য তিনটি মৌল উপাদানের প্রয়োজন, ভূমি, পুঁজি ও শ্রম। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বে এই তিনটি উপাদানের সাথে চতুর্থ উপাদান হিসাবে যুক্ত হয়েছে ইনফরমেশন টেকনোলজি। এখন 'সোশ্যাল সায়েন্স এ্যান্ড ন্যাচারাল সায়েন্স'-এর নিয়মগুলি অনেকটা যেন একই বিন্দুতে 'কনভার্জ' করছে। আমরা শ্রমজীবী মানুষের অংশ হিসেবে যারা সংগঠন করি তাঁরা সবাই সমাজবিজ্ঞান নিয়ে চর্চা ও তার প্রয়োগ করে থাকি। আমরা কোন অগ্রগতি, বিজ্ঞানের কোন অবদানকে কখনও অস্বীকার করতে পারি না। তাকে একশত শতাংশ গ্রহণ করি।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকার তার প্রশাসনের কর্মচারীদের জন্য তড়িঘড়ি করে পরিকল্পনাহীন ভাবে ২০১৪ সালে প্রথম 'আই এফ এম এস' বা 'ইন্ডিগ্রেটেড ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' (জি ও নং ২০৮৮/ এফ বি, তাং ২৮/০২/ ২০১৪) চালু করার পরবর্তী ধাপে 'হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' অথবা 'এইচ এম আর এস' সাব-মডিউলটি, ১৭ মার্চ ২০১৭ সালে রাজ্য প্রশাসনে লাগু হওয়ার পর প্রশাসনে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই সংক্রান্ত কার্যধারার ব্যাপক পরিবর্তন আসে। এর ফলে একদিকে যেমন প্রশাসনে কর্মরত অধিকাংশ কর্মচারী অথবা অবসর প্রাপ্ত কর্মচারীদের এই নতুন ধরনের কর্মপন্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান বা ধারণা না থাকার কারণে তাঁদের ন্যায্য প্রশাসনিক অধিকার সমূহ প্রয়োগ অথবা প্রশাসনিক অর্জিত অধিকার সমূহ ভোগ করার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে। তেমনি অপরদিকে এই পরিকল্পনাহীন ভাবে প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে বহু কর্মচারীপদ উদ্বৃত্ত ঘোষণা করে সেইসব শূন্যপদে নিয়োগ বন্ধ করা হয়েছে, যা শ্রমজীবী মানুষের উপর চরম আঘাত নামিয়ে আনে। অথচ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি আমাদের মতো সংগঠন সবসময় সাদরে গ্রহণ করে এসেছে। সেই কারণেই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও তার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সমিতিগুলি কর্মচারীদের স্বার্থে উদ্ভূত এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে বিভিন্ন কর্মশালার মাধ্যমে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে পুস্তিকার মাধ্যমে কর্মী-নেতৃত্বদের প্রশিক্ষিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রসঙ্গক্রমে, মনে রাখা দরকার যে, আমাদের রাজ্য তথা দেশ মানব সম্পদে সমৃদ্ধশালী---তাকে অবহেলা করার বিরুদ্ধে আমাদের সংগঠন লাগাতার লড়াই-সংগ্রাম জারি রেখেছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য সুব্রত কর্মকারের নেতৃত্বে গঠিত টিমের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই পুস্তিকাটি তৈরি করে সকল কর্মচারীদের (অবসরপ্রাপ্ত সহ) হাতে তুলে দেওয়ার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই পুস্তিকাটি সকল কর্মচারী-কর্মী-নেতৃত্ব-এর কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় দলিল হিসাবে গ্রহণীয় হবে। □

চিন্তায় ও কর্মে রেনেসাঁর প্রতিনিধি

শাশ্বতী মজুমদার

সত্যজিৎ রায় মারা যাবার পর শ্যাম বেনেগাল তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন, ''ভারতের শেষ রেনেসাঁ ম্যান''। সেই সত্যজিৎ রায়ের ২৯টি ফিচার ফিল্মের মধ্যে ১৪টিতে অভিনয় করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। 'অপুর সংসার'-এ রোমান্টিক তরুণ, আবার 'অভিযান' অবাঙালী ট্যাক্সি ড্রাইভার, 'হীরক রাজার দেশে'-তে রাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো উদয়ন পণ্ডিত, 'গণশত্রু'র দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আদর্শবাদী ডাক্তার, 'শাখাপ্রশাখা'য় মানসিক অসুস্থ এক ব্যক্তি—নানা বিচিত্র চরিত্রে ছড়িয়ে আছে তাঁর অভিনয়ের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এছাড়াও সত্যজিৎ রায় তাঁর বাবা সুকুমার রায়কে নিয়ে যে তথ্যচিত্র করেছিলেন তাতে ভয়েস ওভার ছিল সৌমিত্রর এবং সেখানে ব্যবহৃত সুকুমার রায়ের 'লক্ষণের শক্তিশেল' নাটকের অংশে রামের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। মনে করা যেতে পারে অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের শৈল্পিক ভাবনা প্রকাশের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সহযোগী। অনেকের মতে অভিনেতা সৌমিত্র প্রায় হয়ে উঠেছিলেন সত্যজিৎ রায়ের 'অল্টার ইগো' অর্থাৎ সত্যজিৎ নিজের সৃজনশীল প্রকাশের বিকল্প মাধ্যম হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন সৌমিত্রকে। এমনকি সৌমিত্রর আদলেই তিনি ফেলুদা সিরিজের ইলাসট্রেশনে ফেলু মিত্তিরের চরিত্রের স্কেচ পর্যন্ত করতেন, যে ফেলুদা চরিত্র এবং প্রোফেসর শঙ্কুর চরিত্র স্বয়ং সৌমিত্রর মতে সত্যজিতের নিজের সত্ত্বার দুটি দু'রকমের প্রলম্বিত রূপ, সত্যের সন্ধান যার অনন্য বৈশিষ্ট্য। বিশ্ব চলচ্চিত্র ঘাঁটলে একমাত্র জাপানের চলচ্চিত্রকার আকিরা কুরোসাওয়া ও অভিনেতা তোশিরো মিফুনের এরকম সৃজনশীল যুগলবন্দী দেখতে পাওয়া যায়। কুরোসাওয়ার ৩০টি ফিল্মের মধ্যে ১৬টিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন জনপ্রিয় জাপানী অভিনেতা মিফুন। সিনেমায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে ফরাসি সরকারের সর্বোচ্চ সম্মান 'লিজিয়ন অফ অনার' এদেশে পেয়েছেন শুধু দু'জন। সত্যজিৎ রায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

যদিও সত্যজিৎ-সৌমিত্রের স্বকীয় ব্যক্তিত্ব ও পারস্পরিক প্রভাব অভিনয় বা সিনেমা ছাড়িয়েও সংস্কৃতির আরও নানা শাখায় বিস্তৃত। সত্যজিৎ রায় লেখক ও চিত্রনাট্যকার, সৌমিত্র কবি, আবৃত্তিকার ও নাট্যকার। প্রকাশিত কবিতার বইয়ের সংখ্যা ১৫ এবং প্রকাশিত নাটকের সংখ্যা ২৯। তাঁরা দু'জনেই পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। সত্যজিৎ ছোটোদের জন্য সম্পাদনা করেছেন 'সন্দেশ' পত্রিকা। সৌমিত্র যে সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করতেন বন্ধু নির্মাল্য আচার্যের সঙ্গে সেই 'এক্ষণ' পত্রিকার নাম ঠিক করে দেন ও মলাটলিপি করে দেন সত্যজিৎ। সৌমিত্র প্রথমে পেশাদার থিয়েটারে পরে নিজস্ব নাটকের দল করে নাটক পরিচালনা ও অভিনয় করতেন। সত্যজিতের ফিল্মের ডিটেলিং থেকে শিক্ষা নিয়ে সৌমিত্র আধুনিকতার ছোঁওয়া আনেন সেট, অভিনয় সহ নাট্য পরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে। প্রথাগত শিক্ষা ছাড়াই সৌমিত্র ছবি আঁকতে শুরু করেছিলেন এবং প্রদর্শনীও হয়েছিল। বহুমুখী কর্মোদ্দীপনার এই বিস্তার প্রসঙ্গে যাঁর কথা এসে যাবেই তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যিনি বাংলার রেনেসাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান এবং সত্যজিৎ ও সৌমিত্রের ওপর যাঁর প্রভাব অসামান্য। রেনেসাঁর উদার মানবতাবাদী চেতনা, যুক্তিনির্ভর জ্ঞানের অন্বেষণ এবং এসবের শিল্পিত প্রয়োগের আকাঙ্ক্ষার উত্তরাধিকার রবীন্দ্রনাথের থেকে সত্যজিৎ পেয়েছিলেন এবং পারিবারিকভাবে ছাড়াও মূলত সত্যজিতের হাত ধরে সৌমিত্র পেয়েছেন সেই লিগ্যাসি। তাই তাঁর মৃত্যুর পরও কেউ কেউ তাঁর সম্বন্ধে শ্রদ্ধায় বলছেন, রেনেসাঁ ব্যক্তিত্ব।

শুধু সত্যজিৎ রায় নন, ঋত্বিক ঘটক ছাড়া বাংলার প্রায় সব শক্তিশালী পরিচালক—মৃণাল সেন, তপন সিনহা, অজয় কর, অসিত সেন, তরুণ মজুমদার, গৌতম ঘোষ, অপর্ণা সেন, ঋতুপর্ণ ঘোষ প্রমুখের অসংখ্য ছবিতে নায়কের ভূমিকায়, ভিলেন বা চরিত্রাভিনেতা হিসাবে কাজ করে অতি উঁচুদরের অভিনয়ের বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছেন সৌমিত্র, যেভাবে ইতালিয় অভিনেতা মার্চেল্লো মাস্ত্রোয়ানি ইউরোপের নানা বিদগ্ধ পরিচালকের পছন্দের তালিকায় ছিলেন। সমসময়ের এইসব শ্রেষ্ঠ পরিচালকদের সবার পছন্দের তালিকায় থাকার মতো অবিশ্বাস্য ঘটনা সম্ভব হয়েছিল সৌমিত্রর অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে সংবেদী, পরিশীলিত, আধুনিক মননশীলতার জন্য।

১৯৫৫ সালের ২৬ আগস্ট সত্যজিতের 'পথের পাঁচালী'-র মুক্তি ভারতের চলচ্চিত্রে নতুন ধারা তৈরি করেছিল। এদেশের সাহিত্যে, শিল্পকলায় এবং নাটকে বাস্তবধর্মী চিত্রায়ণ আগেই শুরু হলেও ফিল্মে তখনও পর্যন্ত তার স্পর্শ লাগেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে সারা পৃথিবীতে চিন্তার জগতে যে ভাঙচুর দেখা দিয়েছিল এবং যার আঘাতে চলচ্চিত্রে প্রথম ইতালিতে নিও রিয়েলিজম আন্দোলন শুরু হয়েছিল। দরিদ্র এবং শ্রমজীবী মানুষের জীবনের কাহিনী উঠে এল ফিল্মে। চ্যালেঞ্জ জানালো তুমুল পুঁজিনির্ভর হলিউডের প্রচলিত ধারার ছবিকে। এদেরই অন্যতম প্রতিনিধি হয়ে ১৯৪৮-এ ভিত্তোরিও ডি সিকার অস্কারবিজয়ী ছবি 'বাই সাইকেল থিভস' যেন একটা জানলা খুলে দিয়েছিল বাইরের পৃথিবীর সামনে। অপ্রথাগত অভিনেতা বা নন-অ্যাক্টরদের দিয়ে সাধারণ পরিবেশে তৈরি করা সিনেমায় দেখা গেল বাস্তব পৃথিবী ও মানুষের বাস্তব জীবন সম্পর্কে নতুন দর্শন, নতুন ভাষ্য। তারওপরে ৬০-এর দশকে ইতালির ফেদেরিকো ফেলিনি ও ফরাসি দেশের চলচ্চিত্রের 'নিউ ওয়েভ'-এর এক ঝাঁক চলচ্চিত্রকারের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলচ্চিত্রের স্বতন্ত্র ভাষার সন্ধানে যাত্রা। নিও রিয়েলিজমের আদর্শ সরাসরি অনুকরণে নয় বরং দেশজ সংস্কৃতির শিকড়ের থেকে প্রাণরস নিয়ে নতুন অঙ্কুর মাথা তুলল 'পথের পাঁচালী'তে।

১৯৫৯ সালে অপু ট্রিলজির শেষ ছবি 'অপুর সংসার'-এর অপূর্ব রায় হয়ে বাংলা সিনেমার দর্শকদের সামনে আত্মপ্রকাশ করলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। ততদিনে স্বাধীনতার মোহ কেটে যাওয়ার যন্ত্রণা শুরু হয়েছে দেশের সাধারণ মানুষের। তাদের বিক্ষোভে উত্তাল সেই সময়ের সন্তান অপু, যে অর্থাভাবে কলেজের পড়া অসমাপ্ত রেখে চাকরির সন্ধান করতে বেরোয়, যে চিৎপুর রেলইয়ার্ডে টহলদারি পুলিশের সামনে বলে ওঠে দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'-র নিমচাঁদের ডায়লগ,—'আমি হলাম হিমাদ্রি অঙ্গজ মৈনাক, পাখার জ্বালায় জলে ডুবে রয়েছি বাবা...।' এক অর্থে অপুর এই প্রতীকী জীবনের সঙ্গে সৌমিত্রর নিজের জীবনের যোগ রয়েছে। নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ীর শেষজীবনে তাঁর সান্নিধ্যে এসে সিরিয়াস অভিনয় সম্বন্ধে সৌমিত্রের ধারণা জন্মেছিল। আর ছিল তাঁর স্বপ্নময় দুটি চোখ। যে বালকদের জীবনের 'মাধ্যযামে স্বাধীনতা'র বার্তা এসে পৌঁছেছিল সৌমিত্র ছিলেন সেই প্রজন্মের। যুগচিহ্ন বহন করেই বামপন্থার প্রতি আগ্রহী হয়েছিলেন তিনি ষাটের দশক থেকে।

প্রতিদিনের ক্লিন্নতায় দীন জীবনটাকে অগ্রাহ্য করে নিজের অস্তিত্বের অর্থ খুঁজে চলে তরুণ অপু। আর সৌমিত্র তাঁর স্বপ্নের বাস্তবকে ছোঁওয়ার জন্য বিশ্বাসযোগ্য অভিনয়ের পাঠ নিতে থাকেন সত্যজিৎ ও সে যুগের দিকপাল সহঅভিনেতা ছবি বিশ্বাস, তুলসী চক্রবর্তী, গঙ্গাপদ বসুদের মতো মানুষদের সান্নিধ্যে। আর সেখেন সাধারণ মানুষের জীবনযাপন থেকে। নিবিষ্ট ছাত্রের মতো নিরন্তর প্রচেষ্টা এবং চিরকাল নিজের সৃষ্টির প্রতি অসন্তুষ্টির মধ্যে দিয়ে ৬০ বছরের বেশি দীর্ঘ পেশাদার অভিনয় জীবন ধরে ক্রমবিবর্তিত, ক্রমপরিণত হতে হতে একেবারে বৃদ্ধবয়সে প্রায় হিমালয়ের মতো দুরতিক্রম্য উচ্চতায় পৌঁছে যান। এসবেরই সাক্ষী থাকল তাঁর সমসময়। 'নায়ক' ছবিতে তিনি অভিনয় করেননি। ঐ ছবিতে পুরোনো ও নতুন রীতির অভিনয়ের যে দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে, সৌমিত্র যদিও তাঁর নিজের জীবনে সেই নতুন রীতির প্রতিনিধি। কিন্তু নায়ক অরিন্দমের মতো তিনি চারপাশের সমাজ সম্পর্কগুলো থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে তোলেননি। বাংলা সিনেমার জনপ্রিয় স্টার হয়েও সাধারণ পোষাকে পাড়ার মুদির দোকানে যেতে বা মেয়ের স্কুলের গেটে অভিভাবকদের ভিড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বা কফি হাউসে বন্ধুদের সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা বা নাটকের অভিনয় করতে মফঃস্বলে গিয়ে নাট্যকর্মীদের সঙ্গে আড্ডা দিতে পারতেন তিনি অনায়াসে। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রীতে, নাট্যজগতে, সাহিত্য জগতে নিজের সমবয়সীদের সঙ্গে তাঁর ছিল সুহৃদের সম্পর্ক তরুণ ও নবাগতদের গ্রহণ করতেন সন্তানের মমতায়। শিক্ষনীয় কিছু থাকলে সকলের কাছ থেকেই শিখতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। পঁচাশি বছর বয়স পর্যন্ত নিজের ভিতর কাজের অনুপ্রেরণাকে সজীব করে রাখার চাবি কাঠি হয়তো এখানেই ছিল। গ্রামসি যেমন বলেছিলেন অর্গানিক নেতৃত্ব মানুষের মধ্যে থেকে লড়াই পরিচালনার রসদ যোগাড় করেন, যান্ত্রিক কোনো পদ্ধতিতে নয়, তেমনই যে শিল্প সাধারণের ওপর গভীর প্রভাব রেখে যায় তার কাঁচা উপকরণ শিল্পীকে সংগ্রহ করতে হয় মানুষের কাছ থেকেই, মানুষের থেকে দূরে গিয়ে সে কাজ কিছুতেই হবার জো নেই। সমাজকে নিয়ে যাদের কাজ করতে হয় তাদের সবার ক্ষেত্রে এটি সত্য। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের এই শিক্ষা যেন আমরা ভুলে না যাই।

''সারা জীবন আমার কাজ নিয়ে আমি সংশয়ে আক্রান্ত ছিলাম। আমার ধারণা ছিল, হয়তো বিনোদনের কাজ খুব মূল্যবান নয়। এবং আমি সবসময়েই ভেবেছি এর বদলে আমি যদি অ্যালবার্ট সোয়াইৎজারের মতো কিছু করতে পারতাম, অনেক দূরে কোনো শ্রমিক কলোনিতে গিয়ে মানুষের জন্য কাজ করতে পারতাম তাহলে আমার জীবন সার্থক হতো। কিন্তু গত পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে বারে বারে আমার দেশের মানুষ আমাকে গ্রহণ করে এসেছে, ভালোবেসে এসেছে, তাদের নিজেদের একজন বলে আমাকে ভাবিয়েছে। আমি তাদের ভালোবাসি, তাদের শ্রদ্ধা করি, তাদের জন্যেই আমি পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময়ে এতদূর এসেছি। আমি তাদের স্যালুট করি। আমি যাকে উত্তম শিল্প বলে মনে করি, বিশ্বাস করি তাকে নিয়ে এগিয়ে যাবার শক্তি ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা জুগিয়েছে তারাই।'' এই সহজ কিন্তু গভীর কথাগুলি সম্মানিত গুণীজন এবং বন্ধুবর্গের সামনে ২০১২ সালে চলচ্চিত্রে সারা জীবনের কৃতিত্বের জন্য দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার পাবার দিন মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন ৩৫০-এর বেশি ছবিতে অভিনয় করা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর অনুরাগ গড়ে উঠেছিল পারিবারিক সূত্রে। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সুচিত্রা মিত্র ছিলেন তাঁর ছোটো মাসি। একটি সাক্ষাৎকারে রবীন্দ্রনাথের মানবিক দিক প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সৌমিত্র উদাহরণ দিয়েছিলেন, 'ঝরো ঝরো ঝরিছে বারিধারা' গানটির কথা। বর্ষার বর্ণনা করতে গিয়েও রবীন্দ্রনাথ ভুলছেন না অসহায় গৃহহীন মানুষের কথা—''হায় পথবাসী, হায় গতিহীন, হায় গৃহহারা''। এই ব্যথা, দরদ খুব অনুচ্চকিতভাবে তাঁর নিজের কবিতাতেও দেখা যায়—'নিসর্গের মধ্য এসে দাঁড়ল বলে / তার দু'চোখ জলে ভরে উঠল/ অথচ পৌষের দোলাই গায়ে দেওয়া মানুষদের / সে কিছুতেই স্পর্শ করতে পারল না।'' ''খড়ি ওঠা মানুষেরা রয়ে গেছে / কাক ডাকা ভোরে হিম রাতে তুষের আগুনে। / সেখানেই শর বন / নিরন্নের দেশ সাজাবার ভার নিয়েছে।'' (নিসর্গের দূরত্ব) অথবা ''কোপাই-এর জলে ট্রাক ধুচ্ছে খালাসি / কোপাই-এর জলে ব্যথা ভেসে যাচ্ছে।'' (কোপাই-এর জলে)। ''রাঢ়ের অলৌকিক জ্যোৎস্নার ভিতর / অনিন্দ্য নিসর্গের খুব কাছাকাছি / ঝুপড়িতে গরিবেরা থাকে'' (নিসর্গের কাছেই)। তাঁকেই লিখতে দেখি ''যেতে হলে মানুষের দিকে চলে যাও / বন্দর ছেড়েও নৌকা মানুষেরই দিকে যায় দেখি / অন্য উপকূলে'' (অন্য উপকূলে)। ''পৌষের রাতে কারা ঘরছাড়া / তোমার কি মনে আছে? মনে পড়ে শূন্য গ্রাম / তছনছ, তল্লাস করেছে কার নাম?'' এভাবেই কবিতার পংক্তিতে তাঁর জড়িয়ে থাকে মানুষের কথা, মানুষের জন্য উদ্বেগের কথা।

গদ্য রচনায় তাঁর দেশ, সমাজ, রাজনীতির ভাবনা অনেক সোচ্চার। 'কেন এই জীবন' লিখতে গিয়ে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায়ের 'অলীক সুখ' ফিল্মের প্রবীণ ডাক্তারের কথা লিখছেন (এই চরিত্রে তিনি অভিনয় করেছিলেন)। পরবর্তী প্রজন্মের আর এক ডাক্তারকে তিনি বলেন—কার পিছনে ছুটছ তুমি? কিসের জন্য ছুটছ? তখন ঐ ছবির নায়ক ডাক্তারটি বলেন, আমি তো কোনোদিন আপনি হতে পারব না স্যার। লিখছেন, ''আমার তখন প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে ঃ কেন পারবে না? যুগ যুগ ধরে মানুষের কাছে শিক্ষণীয় কত কিছু রয়েছে।... বাঘা যতীন বন্দুক-হাতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মৃত্যু বরণ করেন, তাঁকে দেখে তো বহু মানুষ প্রাণিত হয়েছিলেন। দেশ এমন একটা ব্যাপার, তার জন্য যে প্রাণ দেওয়া যেতে পারে এ তো আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছ থেকেই শিখেছি।... মধুসূদনের শেষ যে সনেট, চতুর্দশপদী কাব্যের শেষেরটি ঃ ''এই বর, হে বরদে মাগি শেষ বারে,—/ জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ-ভারত-রতনে!''... নিজের জন্য চাওয়া নয় দেশের জন্য চাওয়া। অথচ আমাদের কত রকম চাহিদা বা চাওয়া, সবকিছু পেতে চাওয়া... আমরা কবে যে দিতে চাওয়ায় পৌঁছবো জানি না।'' এই দেশপ্রেমের সঙ্গে হিন্দুত্ববাদীদের দেশপ্রেমের কোনো মিল নেই। তাই 'দেশদ্রোহী' তকমা দিয়ে সরকারবিরোধীদের ওপর মোদী সরকারের দমনপীড়নের বিরুদ্ধে লেখেন, 'দেশদ্রোহী কে?' লিখেছিলেন, ''আমাদের দেশ দরিদ্র, দেশে অনেক অন্যায় অবিচার চলছে, দেশের মানুষ খেতে পায় না, জাতপাতের সমস্যা একটা বিরাট সমস্যা—এসব কথা যদি আমি বলি, তাহলে সেটা কি দেশের বিরুদ্ধাচরণ করা, বা সেক্ষেত্রে কি আমি দেশদ্রোহী?... গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হিসাবে যে কোনো বিষয় নিয়ে মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা আমার আছে, এ আমার অধিকার, স্বাধীন নাগরিকদের অধিকার। সেই মতামত সরকার অনুসারী হলে আমি মস্ত দেশপ্রেমিক, আর তা যদি হয় সরকার বিরোধী তাহলেই আমি ঘোর দেশদ্রোহী? এ তো পরাধীন ভারতের আইন! স্বাধীন দেশে এমন আইন চলবে কেন? মুখে অন্যতম গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে বড়াই করব আর কাজে তার ঠিক বিপরীত? আমার স্পষ্ট উত্তর, কুসংস্কার, অনগ্রসরতা জাতপাতের বিরোধ—এসব জিইয়ে রেখে যারা ব্যক্তিগত তথা রাজনৈতিক ফায়দা লুটছে এবং যাদের জন্য দেশ ক্রমশ অন্ধকার এবং অনগ্রসরতার দিকে পিছিয়ে যাচ্ছে তারাই আসলে দেশদ্রোহী। এমনকি যে সরকার এসব অন্যায় অনুচিত কাজ করছে সেই সরকারই দেশদ্রোহী।'' জে এন ইউ বা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আন্দোলন, পুনার ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের প্রতিবাদের সমর্থনে কলম ধরেছেন। প্রশ্ন করেছেন, ''রোহিত ভেমুলার আত্মহত্যার ঘটনা আমাদের সভ্যতাকে কোনো অতল অন্ধকারে টেনে নিয়ে যায়?'' চিকিৎসক বিনায়ক সেন, ড. শ্যামল জানাকে কারারুদ্ধ করা বা অম্বিকেশ মহাপাত্রদের গ্রেপ্তারের মতো ঘটনাতে তিনি প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন। মনে করেছেন রাজনৈতিকভাবে তৈরি করা সমস্যা রাজনৈতিকভাবেই মোকাবিলা করতে হবে। লেখক, শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, অভিনেতার সেখানে সামিল হওয়া উচিত।

বাক্ স্বাধীনতার অধিকারের দাবিতে চিরকাল সোচ্চার সৌমিত্রকে অসুস্থ দেহে অবস্থান মঞ্চে হাজির হতে দেখি যখন ২০১৮ সালে অনীক দত্তের ছবি 'ভবিষ্যতের ভূত'এ রাজ্যে অদ্ভুত কৌশল করে বন্ধ করে দেওয়া হয়। কাজের ক্ষেত্রে সরকার পক্ষের এবং সরকার বিরোধীদের মধ্যে ভাগাভাগিকে তিনি কোনোভাবেই সমর্থন করতে পারতেন না। নিজের যৌবনেও সৌমিত্র দেখেছিলেন চলচ্চিত্র শিল্পীদের মধ্যে ভাগাভাগি। ৬০-এর দশকে টালিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রিতে তখন শিল্পী কলাকুশলীদের দাবি আদায়ের সংগঠন অভিনেতৃ সংঘ। পরে তা ভেঙে কায়েমী স্বার্থের মদতে তৈরি হয়েছিল শিল্পী সংসদ। সৌমিত্র ছিলেন অভিনেত্রী সংঘের সেক্রেটারি, অনুপকুমার ছিলেন কালচারাল সেক্রেটারি, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ভাইস প্রেসিডেন্ট। ৬০-এর দশকের শেষের দিকে সিনেমা হলে শ্রমিকদের লাগাতার ধর্মঘটের সমর্থনে দাঁড়ায় অভিনেতৃ সংঘ। সেজন্য মালিকদের সংগঠন ইম্পা সৌমিত্র সহ কয়েকজনকে ব্ল্যাকলিস্ট করে। পরবর্তীকালে নির্মল ঘোষ এবং অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ও যোগদান করেন। শিল্পী সংসদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন উত্তমকুমার। সেই সময়ের অভিজ্ঞতা ছিল খুবই তিক্ত। ড. নারায়ণ রায়ের নির্বাচনী কেন্দ্রে প্রচারের কাজে যুক্ত থাকার কারণে একবার তাঁর মির্জাপুরের বাড়ির সামনে বোমাবাজি হামলা চালিয়েছিল কংগ্রেসী দুষ্কৃতীরা। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় শহীদ মিনার ময়দানে বিশাল সমাবেশে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সৌমিত্রর নেতৃত্বে অভিনেতৃ সংঘের শিল্পীরা। তবু পেশাদার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জাগা কতগুলো প্রশ্নও ছিল

● সপ্তম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ আসলে সরকারের ভয়ের বহিঃপ্রকাশ

উৎসর্গ মিত্র

গত ২০১৯ সালের মাঝামাঝি, ২৩ জুলাই তারিখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে এক খোলা চিঠি পাঠানো হয়েছিল। চিঠি, তা সে খোলা হোক বা বন্ধ, পাওয়াটা তাঁর কাছে কোনো বড়ো ব্যাপার না, কারণ তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী। হররোজ নানারকম চিঠি পাওয়ার কথাই তাঁর। তাঁর অধীনে আস্ত একটা দপ্তরই আছে এ সমস্ত চিঠি সামলানোর জন্যে। তারা চিঠির গুরুত্ব অনুযায়ী সেগুলি বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দেয় সুরাহা করতে, তবে যেগুলি একান্তই ব্যক্তিগত কাজের জন্যে লেখা, সেগুলির জায়গা হয় সাধারণত বাজে কাগজের ঝুড়িতে। এ চিঠিটা কিন্তু ছিল একেবারে অন্যরকম, এর লেখকও কোনো একজন না। নিজেদের 'গর্বিত ভারতবাসী' মনে করেন এমন ঊনপঞ্চাশ জন মানুষ ছিলেন ওই চিঠির লেখক। 'এটা যে এখন মধ্য যুগ না এবং দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র বজায় রাখতে গেলে অবশ্যই বিরোধীদের যে প্রয়োজন আছে'—এ কথা প্রধানমন্ত্রীকে সবিনয়ে মনে করিয়ে দিয়ে রামের নাম নিয়ে দেশে ক্রমাগত চলতে থাকা মুসলিম ও দলিত নিধন বন্ধে এবং যারাই তাঁর সরকারের সমালোচনা করছে, তাদেরকেই যেভাবে 'দেশদ্রোহী' তকমা দেওয়া হচ্ছে তা বন্ধে যেন তিনি নিজে উদ্যোগ নেন, এমন অনুরোধ জানিয়েই লেখা হয়েছিল ওই চিঠিখানা। কোনো আটপৌরে লোক না, দেশকে গর্বিত করতে পারেন এমন একজন, দু'জন না—রীতিমতো ঊনপঞ্চাশ জন মানুষ ছিলেন ওই চিঠির রচয়িতা। তা সত্ত্বেও না প্রধানমন্ত্রী নিজে, না তাঁর দপ্তর—কেউই এ চিঠি নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য তো দূরস্থান, প্রাপ্তি স্বীকার পর্যন্ত করেনি। দেশবাসীও এ ব্যাপারে একেবারেই অন্ধকারে ছিল, কারণ ঐ মানুষগুলি 'পরম বিশ্বাসে' একমাত্র প্রধানমন্ত্রীকেই তাঁদের মনের কথা জানিয়েছিলেন, আর কোথাও না। কিন্তু মজার কথা হলো, তা সত্ত্বেও সুধীর কুমার ঝা নামে মোদির এক অন্ধ ভক্ত এবং পেশায় উকিল, ৩ অক্টোবর তারিখে মুজফফরপুর কোর্টের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এর বিরুদ্ধে 'দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করা, ধর্মীয় ভাবাবেগকে আঘাত করা, প্রধানমন্ত্রীর উজ্জ্বল ভূমিকাকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে কালিমালিপ্ত করা এবং দেশদ্রোহিতা'র অভিযোগে মামলা দায়ের করলো এবং আশ্চর্যের বিষয়, আদালতও সে মামলা গ্রহণ করলো শুধু না, পুলিশকে নির্দেশ পর্যন্ত দিল ঐ ঊনপঞ্চাশ জনেরই বিরুদ্ধে এফ আই আর দায়ের করার! অর্থাৎ, দেশকে ভুরি ভুরি সম্মান এনে দিয়েছেন এমন ঊনপঞ্চাশ জন কৃতীকে শুধুমাত্র একটা খোলা চিঠি লেখার 'অপরাধে' আদালতের রোষের শিকার হতে হলো ঐ দিন থেকে। রাশি রাশি কাগজের তলায় ফেলে দেওয়া এ চিঠির খবর ঐ ভক্ত কোথা থেকে পেল, সেটা জানা না গেলেও ওই মামলা করা এবং তা গ্রহণের মধ্যে দিয়ে দেশের 'গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার' কি হাল এখন হয়েছে সেটা কিন্তু একেবারে স্পষ্ট হয়ে যায়।

এই ঊনপঞ্চাশ জনের মধ্যে ডাঃ বিনায়ক সেন, আদুর গোপালকৃষ্ণান, মণি রত্নম, অনুরাগ কাষ্যপ, অপর্ণা সেন, কোঙ্কণা সেন শর্মা, সৌমিত্র চ্যাটার্জী, শ্যাম বেনেগাল, শুভা মুদ্গল, অনুপম রায়, রূপম ইসলাম, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, রিদ্ধি সেন, অঞ্জন দত্ত, আশিস নন্দী, কেতন মেহতা, গৌতম ঘোষ, কৌশিক সেন, সুমিত সরকার, তনিকা সরকার যেমন ছিলেন, তেমনই ছিলেন দেশের একজন প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ ও ঐতিহাসিক অধ্যাপক রামচন্দ্র গুহও। এই চিঠি প্রকাশ হওয়ার অনেক পরে, ডিসেম্বর মাস নাগাদ গুহ বাঙ্গালোরে টাউন হলের সামনে একাই দাঁড়িয়েছিলেন। এটা এমন একটা সময়ে, যখন গোটা দেশের সাথে বাঙ্গালোরও উত্তাল হয়েছে বি জে পি-আর এস এস-এর মস্তিষ্ক প্রসূত নাগরিকত্ব সংশোধন বিলের বিরুদ্ধে। এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে এই বিল আসলে সংবিধান বর্ণিত বহুত্ববাদী ভারতবর্ষকে এক মধ্যযুগীয় হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্র মাত্র। স্বাভাবিক ভাবেই কোনোও সুস্থ মানুষ একে মেনে নিতে পারে না। গোটা দেশ তাই সেই সময়ে উত্তাল ছিল এর বিরুদ্ধে। বাঙ্গালোরও এর ব্যতিক্রম ছিল না। প্রতিবাদীদের ছত্রখান করতে বিজেপি শাসিত কর্ণাটকের পুলিশ তাদের ওপর যথেচ্ছ লাঠি, টিয়ার গ্যাস, জলকামান এমনকি গুলি অবধি চালিয়েছিল। প্রতিবাদীরা হতাহত হয়েছেন, তবু এক মাস ধরে পিছু হঠেননি। প্রতিবাদীদের মধ্যে গুহও ছিলেন। শেষপর্যন্ত সেখানে জারি করা হয়েছে ১৪৪ ধারা। যখন সারা দেশ গান্ধিজীর ১৫০তম জন্মজয়ন্তী পালন করছে, তখনই দেখা গেল গান্ধীকে আটকানোর জন্যে ব্রিটিশ পুলিশ যে দানবীয় ধারা জারি করতে অভ্যস্ত ছিল সারা দেশে, মোদিও সেই একই ধারা প্রয়োগ করছে প্রতিবাদীদের আটকানোর জন্য। তবু গুহ সেদিন গিয়েছিলেন টাউন হলের সামনে এক

টেলিভিশন চ্যানেলে ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য। ১৪৪ ধারা নিয়ে তিনি মাথা ঘামাননি, কারণ ওই ধারা বলে চারের বেশি মানুষের এক জায়গায় থাকা নিষেধ। যেহেতু তিনি একা ছিলেন আর চ্যানেলের পক্ষ থেকে এক জন সাংবাদিক আর এক জন ক্যামেরাম্যান ছাড়া আর কেউ ছিলেন না, সেহেতু তাঁর সেখানে দাঁড়ানোয় আইনগত কোনো বাধা থাকারও কথা ছিল না। কিন্তু যেহেতু সেখানে সরকারটা চলছে বিজেপির নেতৃত্বে আর গুহর বক্তব্যও ছিল বি জে পি-র হিন্দুত্ববাদী দর্শনের বিরুদ্ধে, সেহেতু দেখা গেল কথা শুরুর সাথে সাথেই জনা তিনেক উর্দিধারী পুলিশ এসে তাঁকে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল। গ্রেপ্তার হলেন রামচন্দ্র এবং আরও একবার স্পষ্ট হলো দেশে গণতন্ত্রের অবস্থা।

গণতন্ত্র মানে হলো বাক্‌স্বাধীনতা। গণতন্ত্র মানে হলো কারুর কোনো ক্ষতি না করে নিজের মতো করে বাঁচবার অধিকার, নিজের দাবি জানাবার অধিকার, কোথাও অন্যায় দেখলে প্রতিবাদের অধিকার, বিপন্নের পাশে দাঁড়াবার অধিকার। কোথায় সে সব? এখন দেশের সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে তাকে জঙ্গী দমন আইনে গ্রেপ্তার করাটাই দস্তুর। সংসদে এখন আলোচনার অধিকার কেড়ে নিয়ে বিল পাশ করানোটাই দস্তুর। যে সমস্ত সংস্থা তাদের কাজ করতে গিয়ে সরকার বিরোধী কোনো কথা বলতে বাধ্য হয়, তাদের অনুদান বন্ধ করাটাই দস্তুর। যে মানুষগুলো তাদের সারা জীবন বিপন্নের সেবা করে এসেছে বা আসছে, তাদের জন্যে বিচারের ব্যবস্থা করছে, সরকারের বিরুদ্ধে গলা তুললেই তাদের জেলে পাঠানোটাই দস্তুর। দেশে এখন ইউ এ পি এ বলে একটা দানবীয় আইন আছে, যার পুরো কথা হলো আনলফুল অ্যাক্টিভিটিস প্রিভেনশন অ্যাক্ট আর যার মোদ্দা কথা হলো সরকারের যদি কোনো কথা বা কাজ পছন্দ না হয়, তাহলে তাকে 'আনলফুল' দেগে দিয়ে জেলে ভরে দিতে পারবে। বলে দেওয়া নেই কোন কোন কাজ বা কথা 'আনলফুল'। বলে দেওয়া নেই কোনটা 'আনলফুল' আর কোনটা নয়, সেটা দেশের সরকার ঠিক করবে, না সংবিধান ঠিক করবে। শুধু বলে দেওয়া আছে যে, এই আইন যদি কারো ওপরে প্রয়োগ হয়, তাহলে তার জামিন পাওয়ার কোনো অধিকার নেই। এই আইন প্রয়োগের ফলেই ঊনআশি বছরের বামপন্থী কবি ভারভারা রাও, ট্রেড ইউনিয়ন নেত্রী সুধা ভরদ্বাজ, মানবাধিকার কর্মী গৌতম নওলাখা কিম্বা আইনজীবী অরুণ ফেরেরাকে আজও জেলের অন্ধকারে কাটাতে হচ্ছে কারণ তাঁরা সরকারের অন্যায় নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে জনমত তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন, সুতরাং তাঁরা 'দেশদ্রোহী'। এখনও অভিযুক্ত অবস্থায় আছেন জওহরলাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক জয়তী ঘোষ, সাংবাদিক যোগেন্দ্র যাদব, চলচ্চিত্র নির্মাতা রাহুল রায় কিম্বা সি পি আই (এম)-এর সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির মতো ব্যক্তিরা। দিল্লীর শাহীনবাগে ধর্ণা মঞ্চে উপস্থিত থেকে আসলে নাকি এনারা জাতিদাঙ্গায় উৎসাহ যুগিয়েছেন। সুতরাং এনারাও 'দেশদ্রোহী', শুধু কিছু 'টেকনিক্যাল' অসুবিধা থাকার দরুণ এনারা এখনও জেলের বাইরে, নতুবা... হ্যাঁ এটাই আজকের দস্তুর!!

অথচ এরকম হওয়ার তো কথা ছিল না! যে সরকারের সব সময়ে গদি হারানোর ভয় থাকে, সে তার বিরুদ্ধে ওঠা কথাকে গায়ের জোরে থামিয়ে দিতে চাইবে এটা স্বাভাবিক, কিন্তু যে দলকে মানুষ পর পর দুই বার ক্ষমতায় বসিয়েছে এবং শেষের বার এক বিশাল সংখ্যার সাংসদ দিয়ে সরকারে পাঠিয়েছে, তার কিসের ভয়? কেন সে চাইছে তার বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত আওয়াজের উৎসগুলোকে টিপে মারতে? যে বিশাল সংখ্যা গরিষ্ঠতা দিয়ে মানুষ নরেন্দ্র মোদিকে শাসন ক্ষমতায় বসিয়েছে পর পর দুই বার, তাতে দেশের মধ্যে গজিয়ে ওঠা কোনো ছোটোখাটো বিক্ষোভকেই পাত্তা দেওয়ার কথা না সরকারের। সামান্য কিছু রাজনৈতিক বা সামাজিক জয়-পরাজয়ের থেকে তার অনেক বেশি এখন মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়ে গিয়েছে দেশের মঙ্গল সাধনের। দেশের অর্থনীতিতে যে সমস্ত ফাঁক-ফোঁকর আছে, সেগুলির মেরামত করার বিস্তর সুযোগ তো দিয়েছে মানুষ এই সরকারকে।

এমন চমৎকার সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে যে কোনো সরকার মনে রাখার মতো অনেক কিছুই করতে পারতো। সে পারতো দেশের নির্বাচন পদ্ধতির পরিবর্তন করে এমন ব্যবস্থা করতে যাতে সংসদ বা বিধানসভাগুলিতে ঘোড়া কেনা-বেচা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়, শুধুমাত্র ক্ষমতায় থাকার লোভে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা যেন কোনোভাবেই নির্বাচকদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে না পারে। সে পারতো দেশের আর্থিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তুলতে, পারতো দেশের অপরিমেয় বেকারদের দিকে ভরসার হাত বাড়িয়ে দিতে। সরকার পারতো বহু বহু সামাজিক প্রকল্প গড়ে তুলতে, যাতে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা বৈষম্যগুলোর সমাপ্তি ঘটিয়ে দেওয়া যায়।

দেশে এখনও পর্যন্ত সরকারী ব্যবস্থাপনায় কোনো বিশ্বমানের বুনিয়াদি শিক্ষালয় নেই, নেই কোনো বিশ্বমানের মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষালয়। যে সরকার নিজেদের বর্ণনা করে সবার থেকে আলাদা বলে, তারা তো পারতো এ ধরনের ব্যবস্থা গোটা দেশজুড়ে গড়ে তুলতে। গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা মেধাবী ভারতীয়দের তখন ডেকে বলতে পারতো, ''ফিরে এসো নিজের দেশে, আমরা অন্য সব জায়গাকে টেক্কা দেওয়ার মতো ব্যবস্থা গড়ে দিয়েছি তোমাদের নিজের দেশেই... ফিরে এসো, আরও ভালোভাবে আমরা গড়ে তুলবো দেশটাকে''... দেশের মানুষকে তারা জানিয়ে দিতে পারতো যে, যদিও সরকার ক্রমশঃ উন্নয়নের পথেই হাঁটবে, তবুও তারা এমন কিছুই করবে না, যাতে দেশের সাধারণ মানুষের কোনো ক্ষতি হয় এবং যদি হয়ও কখনও, তাহলে সরকার নিজেই উপযুক্ত পুনর্বাসন দিয়ে সে ক্ষতি যতটা সম্ভব পূরণের চেষ্টা করবে। এই ধরনের বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা থাকলে যে আত্মবিশ্বাস থাকা উচিৎ সরকারের, সেটা থাকলে নাগরিকদের তথ্য জানার অধিকারকে সঙ্কুচিত করার বদলে তাকে আরও প্রসারিত করতো সরকার, জগৎকে সে দেখিয়ে দিতে পারতো আসলে গণতন্ত্র বলতে কী বোঝায়! কিন্তু...

সুইডেনের 'ভি-ডেম ইন্সটিটিউট' পৃথিবীর সব ক'টা গণতান্ত্রিক দেশের ওপর সমীক্ষা করে সে দেশগুলোয় গণতন্ত্রের হাল-হকিকৎ নিয়ে প্রতি বছর একটা রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই সংস্থাটি সম্পূর্ণ স্বয়ং শাসিত এবং পৃথিবীর বৃহত্তম তথ্যভাণ্ডারগুলির একটি রয়েছে এদের দখলে। সম্প্রতি 'একনায়কতন্ত্রের প্রভূত বৃদ্ধি—ক্রমবর্ধমান প্রতিবাদ ও গণতন্ত্রের পরিস্থিতি ২০২০' (Autocratization Surges—Resistance Grows, Democracy Report 2020) শীর্ষক যে প্রতিবেদন তারা প্রকাশ করেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে গত দশ বছরে যে সব দেশে একনায়কতন্ত্র কায়েম করার প্রবণতা সাঙ্ঘাতিক ভাবে বেড়েছে, তাদের মধ্যে হাঙ্গেরি, তুরস্ক, পোল্যান্ড, সার্বিয়া এবং ব্রাজিলের সাথে আমাদের ভারতও রয়েছে। এই সংস্থাটির তথ্যভাণ্ডার বলছে একনায়কতন্ত্রকামী সরকারগুলি প্রথমেই হাত বাড়ায় নাগরিক অধিকার, বিশেষতঃ প্রতিবাদের অধিকারের দিকে এবং তারপরেই হাত বাড়ায় সংবাদ মাধ্যমের দিকে কারণ এরাই সরকারের প্রতি 'ওয়াচ ডগ' বা প্রহরীর ভূমিকা পালন করে। যখন এই দুটির ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ নিরঙ্কুশ হয়ে ওঠে, তখন তারা হাত বাড়ায় নির্বাচনী বিধি-ব্যবস্থাগুলির দিকে।

এই রিপোর্টকে মাথায় রেখে এবারে ভারতবর্ষের দিকে তাকানো যাক। যে কোনো দেশে গণতন্ত্র যে চারটে স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের মধ্যে সংবাদ মাধ্যমকে বলা হয় সেই চারের চতুর্থ স্তম্ভ (বাকি তিনটি যথাক্রমে আইন সভা, আমলাতন্ত্র ও বিচার ব্যবস্থা)। এই চারটে স্তম্ভের ভারসাম্যের ওপর নির্ভর করে গোটা গণতন্ত্রেরই ভারসাম্য। এ দেশের সংবাদ মাধ্যমকে এখন আর কিছুতেই সেই চতুর্থ স্তম্ভ বলা যায় না। গত দশ-এগারো বছর ধরে দেশের শাসক গোষ্ঠীর ক্রমাগত হস্তক্ষেপের ফলে এখানকার সব ধরনের সংবাদ মাধ্যমই এখন চরম ভাবে পোলারাইজড বা সমবর্তিত। এদের প্রায় প্রত্যেকের এখন নিজস্ব রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি করে দেওয়া হয়েছে এবং তা এবশ্যই সরকারমুখী। সরকারকে প্রশ্ন করা নয়, সরকারের সমস্ত কাজের সাফাই দেওয়াই এখন এদের মুখ্য কাজ। অর্থাৎ এ দেশের সংবাদ মাধ্যম এখন তার 'ওয়াচ ডগ' এর ভূমিকা হারিয়েছে এবং সমাজ বিজ্ঞান বলে, সংবাদ মাধ্যম যখন তার নির্দিষ্ট ভূমিকা হারিয়ে ফেলে, তখন তার অস্তিত্ব থাকা আর না তাকার মধ্যে কোনো ফারাক থাকে না—সে তখন মূল্যহীন আর ভারতবর্ষের সংবাদ মাধ্যম এখন সেটাই হয়েছে।

এই কারণেই খবরের কাগজগুলোয় এখন এতো কেচ্ছা কেলেঙ্কারির ছড়াছড়ি, নিউজ চ্যানেলগুলোয় বিতর্কের নামে অহেতুক চিৎকারের

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে

অতীতের দর্পণে বর্তমানকে না দেখতে পারলেই বিপদ

মানস কুমার বড়ুয়া

এই মুহূর্তে দেশের রাজধানীতে প্রবেশের রাস্তাগুলি অবরোধ করে প্রবল ঠাণ্ডা ও বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে দেশের অন্নদাতারা লাগাতার প্রায় দেড় মাস ধরে অবস্থান করছেন দেশের নতুন কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে। এই আন্দোলন চলাকালীন প্রাণ গেছে ৬০ জন কৃষকের। স্বাধীনতার পর এত তাৎপর্যপূর্ণ ও বৃহৎ কৃষক আন্দোলন দেশ দেখেনি। আন্দোলনরত কৃষকদের পাশে রয়েছে অন্যান্য ক্ষেত্রের শ্রমিক-কর্মচারীবৃন্দ, বিভিন্ন গণসংগঠনসমূহ, বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি, কংগ্রেস এবং অন্যান্য আঞ্চলিক দলগুলি। এমনকি এন ডি এ-র কয়েকটি শরিক দলও। দেশের প্রধানমন্ত্রী চোখে ঠুলি, কানে তুলো দিয়ে বসে আছেন। সরকারের সাথে ইতিমধ্যে কৃষকদের আট দফা নিষ্ফলা বৈঠক হয়েছে। কৃষকরা আইনের কোনো সংশোধন চান না। তাঁদের পরিষ্কার দাবি নয়া কৃষি আইন বাতিল করতে হবে। এই দাবিতে তারা অনড় থেকে মরণপণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

এই আন্দোলনের শুরুর দিকে হঠাৎ করে আমাদের রাজ্যের শাসকদলের এক সাংসদ প্রতিনিধিকে আন্দোলনরত কৃষকদের সাথে কথা বলতে দেখে রাজ্যবাসী কিছুটা অবাকই হয়েছে। তিনি বলেছেন, যে রাজ্যের শাসকদল নাকি এই আন্দোলনের পাশে আছে। এই সংবাদ গণমাধ্যমে প্রত্যক্ষ করে রাজ্যের কৃষকরা দুঃখের মধ্যেও হয়তো হেসেছেন। কারণ ২০১১ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর রাজ্যে কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে সঙ্কট ক্রমবর্ধমান। ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য থেকে কৃষক বঞ্চিত হচ্ছে। সর্বোপরি বর্তমানে যে কেন্দ্রীয় কৃষি আইনের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে কৃষকরা আন্দোলন করছেন, সেই একই ধরনের আইন রাজ্য সরকার চালু করেছে ২০১৪ সালে। কাজেই রাজ্যের শাসকদলের দেশের সাম্প্রতিক কৃষি আইন বিরোধীতাকারী কৃষকদের পাশে দাড়ানোর উদ্দেশ্য আসলে কৃষকদরদী সেজে জাতীয় স্তরে নিজেকে প্রাসঙ্গিক করার বৃথা চেষ্টা মাত্র। আদতে তৃণমূল কংগ্রেস আর বি জে পি-র অর্থনৈতিক নীতি একই। বি জে পি যেমন শ্রমিক-কৃষক স্বার্থবিরোধী নীতি নিয়ে চলে, তৃণমূলও তাই। গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ধ্বংস করা, স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার চালানো এই সব ক্ষেত্রেই দুটি দল একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। আর এস এস নিয়ন্ত্রিত বি জে পি-র মতো তৃণমূল কংগ্রেস ঘোষিত অবস্থানে সাম্প্রদায়িক দল নয় ঠিকই, কিন্তু তাদের দ্বারা বি জে পি-র হিন্দুত্বের রাজনীতি রোধ করতে গিয়ে প্রতিযোগিতা মূলক সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতির প্রয়োগের পরিণতি ভয়ঙ্কর হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তৃণমূলের কোনো বলিষ্ঠ অবস্থান থাকতে পারে না, কারণ তারাই সাম্প্রদায়িক শক্তিকে হাতে ধরে এই রাজ্যে ডেকে নিয়ে এসেছে। মানুষের স্মৃতি বড় দুর্বল---এই বাক্যকে পুঁজি করে রাজনীতি করে দক্ষিণপন্থী দলগুলি। তাই মাঝে মাঝে একটু স্মৃতি রোমন্থন করা দরকার। অতীতের দর্পণে বর্তমানের প্রতিবিম্বকে ঝালিয়ে নেওয়া প্রয়োজন।

ফিরে দেখা-১ ঃ স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসই প্রথম রাজনৈতিক দল যারা সরাসরি সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে রাজনৈতিক ও নির্বাচনী আঁতাত করে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কুমিরকে রাজ্যে ঢোকাতে খাল কাটার কাজ করেছিল তৃণমূল কংগ্রেসই। ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচন হয়। সেই সময় দেশের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি বি জে পি-র সামনে প্রধান রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়ে ওঠার নতুন সম্ভাবনা তৈরি করে। রাজ্যে রাজ্যে নানা কৌশলে আঞ্চলিক দলগুলির সাথে জোট করে বি জে পি সর্বভারতীয় পরিচয় গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। ঠিক তখনই সদ্য গঠিত তৃণমূল কংগ্রেস দলকে নিয়ে দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জী হাত ধরেন বি জে পি-র। পঞ্চায়েত থেকে বিধানসভা-লোকসভার ভোট, সর্বস্তরে বি জে পি এবং তৃণমূল জোট একসঙ্গে থেকেছে। কেন্দ্রে বি জে পি নেতৃত্বাধীন জোট ও সরকারে শরিক থেকেছে তৃণমূল। কলকাতা কর্পোরেশন সহ বিভিন্ন পুরসভা চালিয়েছে জোট করে।

১৯৯৮ সালে তৃণমূল-বি জে পি জোট পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এক বিপজ্জনক উপাদান যুক্ত করেছিল। তৎকালীন বি জে পি সভাপতি লালকৃষ্ণ আদবানি বলেছিলেন, ''পশ্চিমবঙ্গে বি জে পি-র সঙ্গে তৃণমূলের এই জোট এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।'' অন্যদিকে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা জননেতা জ্যোতি বসু বার বার বলতেন, ''তৃণমূলের সবচেয়ে বড় অপরাধ ওরা সাম্প্রদায়িক বি জে পি-কে হাত ধরে ডেকে এনেছে।''

১৯৯৮, ১৯৯৯ দুটি বি জে পি নেতৃত্বাধীন সরকারেরই শরিক ছিল তৃণমূল। এই নির্বাচনকে ব্যবহার করেই ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িক শক্তি পায়ের তলার জমি শক্ত করেছে।

ফিরে দেখা-২ ঃ আজকে ঠেলায় পড়ে মমতা ব্যানার্জী কখনও কখনও বি জে পি-কে দাঙ্গা বাধানো পার্টি বলে ছদ্ম রাগ প্রকাশ করেন। সত্যি সত্যি যখন দাঙ্গার আগুনে গুজরাট জ্বলেছিল, মোদীর নেতৃত্বে হয়েছিল সংখ্যালঘু নিধনের যজ্ঞ, তখন তাঁর ভূমিকা একটু স্মৃতির পাতা উল্টে দেখা যাক।

২০০২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি গোধরায় সবরমতী এক্সপ্রেসে আগুন লাগানো হয়। গুজরাটজুড়ে শুরু হয় হিন্দুত্ববাদীদের দাপাদাপি, দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করে দাঙ্গার আগুন। নরেন্দ্র মোদী তখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী। ১২ এপ্রিল গোয়ায় বি জে পি-র জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে কালিঘাটে মালপোয়ার স্বাদ পাওয়া হিন্দুত্বের 'মঙ্ক' মুখ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী সরাসরি বলেন, ''মুসলিমরা যেখানে থাকেন, সেখানে তাঁরা অন্যদের সঙ্গে বসবাস করতে পারেন না।''

সেই সময় বি জে পি জোটের অন্তত দুটি শরিক দল মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পদত্যাগ দাবি করলেও, মমতা ব্যানার্জী এই হত্যাকাণ্ডের কোনো প্রতিবাদ করেননি। তাঁর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল ''এটা বি জে পি-র অভ্যন্তরীণ ব্যাপার।''

২০০২ সালের ১ মে গুজরাট গণহত্যা নিয়ে লোকসভায় বিরোধীদের আনা সেন্সর প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটিতে বি জে পি জোটের দু-তিনটি দল বাজপেয়ীর পক্ষে সরাসরি না দাঁড়াতে চাইলেও, তৃণমূল যথারীতি ভোটাভুটিতে বি জে পি-র পক্ষ নেয়। মোদীর গদি ঠেকাতে বড় ভরসা সেইদিনও ছিলেন তিনি। বাজপেয়ী, মোদী

● সপ্তম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

LOVE হীন জিহাদ

সুতপা হাজরা

বিগত ২৩ নভেম্বর উত্তরপ্রদেশে বিয়ের জন্য ধর্ম পরিবর্তন সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স ঘোষিত হয়। যোগী-আদিত্যনাথ সরকারের এই নতুন আইনের বয়ানে বলা হয়েছে শুধুমাত্র বিয়ের জন্য কেউ ধর্ম পরিবর্তন করতে পারবেন না, যদি প্রমাণ হয় কেউ বিয়ের জন্য ধর্ম পরিবর্তন করেছেন সেক্ষেত্রে তার জেল ও জরিমানা হবে এবং বিয়ে বাতিল হবে। তবে যদি কেউ ধর্ম পরিবর্তন করে তারপর বিয়ে করতে চান সেক্ষেত্রে উত্তরপ্রদেশের যে জেলার তিনি অধিবাসী সেই জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে বিয়ে করতে পারবেন। অন্যথায় শাস্তি হবে।

এই অধ্যাদেশের ৩নং ধারাটি নামে 'ছলে বলে কৌশলে' অনুষ্ঠিত ধর্মান্তকরণের বিরুদ্ধে হলেও আসলে ধর্মান্তরিত হবার সাংবিধানিক অধিকারের উপরেই আঘাত হানছে এবং 'বিবাহের উদ্দেশ্যে' ধর্মান্তরকরণকে একেবারেই অবৈধ ঘোষণা করছে। ৬নং ধারা অনুযায়ী এমন বিবাহ নাকচ হবে পারিবারিক আদালতে বা অন্য আদালতে। বিবাহের উদ্দেশ্যেই কেউ ধর্ম বদলাচ্ছে কি না তা ঠিক করবেন জেলাশাসক। বিবাহে ধর্মগ্রন্থ উপহার দিলে তা 'লোভ দেখানো' বলে গণ্য হতে পারে। যদি ধর্মান্তরকরণের উদ্দেশ্য 'অবৈধ' বলে প্রমাণ হয়, তাহলে যারা তা করানোর উদ্যোগ নিয়েছিল ১২নং ধারা মোতাবেক তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রুজু করা হতে পারে। পরোয়ানা ছাড়াই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা যাবে এই জামিন অযোগ্য অপরাধের জন্য। ১২নং ধারা অনুযায়ী তাদেরই উপর ভার থাকবে প্রমাণ করার যে তারা দোষী নয়, দোষী প্রমাণিত হলে পাঁচ বছর, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দশ বছর পর্যন্ত কারাবাস। অনেকে নাৎসি জার্মানির 'ন্যুরেমবার্গ' আইনের সঙ্গে এর তুলনা করেছেন, যা ১৯৩৫ সালে হিটলার প্রণয়ন করেছিলেন।

১৯৪৯ সালে জাতপাত নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক নারীপুরুষের বিবাহকে আইনি স্বীকৃতি দেবার একটি আইন সংসদে আনতে গিয়ে আম্বেদকর বলেছিলেন, হিন্দু বিবাহের পাশাপাশি এই নতুন আইন থাকুক, দেখা যাক কালক্রমে কোনটি বেশি জনপ্রিয় হয়। কট্টরদের আপত্তিতে সেই আইন তখনই পাশ করানো যায়নি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে এ ধরনের বিবাহকে সামাজিক স্বীকৃতি দেবার তেমন কোনো উদ্যোগ না থাকা সত্ত্বেও, ১৯৫৪ সালে প্রবর্তিত স্পেশাল ম্যারেজ আইনের অসুবিধাগুলি সত্ত্বেও পরবর্তী সময়ে ভিন্নজাতে এমনকি ভিন্নধর্মে বিবাহ সামান্য হলেও বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্যই তার একটি কারণ স্বাধীন ভারতে মেয়েদের গতিবিধির উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কিছুটা কম ছিল। তারা বুঝতে পারছিল জীবনসঙ্গী নির্বাচনের স্বাধীনতাও একটি অধিকার। ২০০৫-০৬ কর্ণাটক ও পরে কেরালায় একটি নজরদারি সংগঠনের আবির্ভাবের সূত্রে 'লাভ জিহাদ' কথাটির প্রচার শুরু হয়। হিন্দুদের বিপন্নতা বাড়াতে ধর্মান্ধ মুসলিমদের বাহিনী তৈরি হচ্ছে স্কুল, কলেজ, সিনেমা হলে হিন্দু তরুণীদের লোভ দেখিয়ে ধর্মান্তরকরণের ফাঁদে ফেলতে—এই গালগল্পের শুরু সেখানেই। ২০১৪ সালে মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর 'অ্যান্টি রোমিও স্কোয়াড' বা 'হিন্দু বহেন বেটি বাঁচাও সংঘর্ষ সমিতি' জাতীয় সংগঠন তৈরি হতে থাকে সঙ্ঘীদের মদতে। অথচ জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এন আই এ) পর্যন্ত 'লাভ জিহাদের' বাস্তবতা প্রমাণে হার মেনেছে।

যে কোনো রক্ষণশীল সমাজই সম্প্রদায়কে ধরে রাখার জন্য মেয়েদের প্রজনন শক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ জরুরি বলে মনে করে। ব্রাহ্মণ্যবাদ অতীতে মনুস্মৃতির মধ্য দিয়ে সেই চেষ্টাই করেছে। মুসলিম সমাজের বাড়বাড়ন্ত হলে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজ সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে—দেশভাগের অনেক আগে থেকেই এই আতঙ্কের বিষ মানুষের মনে ছড়াচ্ছে হিন্দুত্ববাদীরা, যদিও জনগণনার সাম্প্রতিকতম হিসাবেও এমন ভাবনার কোনো বাস্তব প্রমাণ নেই। 'লাভ জিহাদের' জুজু নতুন করে ঘুলিয়ে তুলছে সমাজের অভ্যন্তরের এই বিষকে। গোটা মুসলিম সম্প্রদায়কে সন্দেহের পাত্র করে তুলছে নারীলোলুপ চক্রান্তকারী রূপে, তার সঙ্গে পরিবর্তনশীল সমাজে মেয়েদের গতিবিধির উপর থেকে পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ ফসকে যাবার ভয় এদের হিংস্র করে তুলছে। মেয়েরা যখন এই পরিস্থিতিতে নিজের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে যাচ্ছে তখনই দেখা দিচ্ছে 'পারিবারিক সম্মান'-এর নামে হিংসাত্মক অপরাধ, খুনজখম, নানাবিধ নজরদারি (vigilante) গোষ্ঠী গড়ে ওঠার সঙ্গে তাল দিয়ে এমন অপরাধ রাজ্যে রাজ্যে বাড়ছে ভীষণভাবে। এই গোষ্ঠীগুলিকে মদত দিতে ব্যস্ত মোদী সরকার এর বিরুদ্ধে কোনো সামগ্রিক আইন আনবে না এটা স্বাভাবিক। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে বিজেপি সরকার এবং প্রশাসনকেই সঙ্ঘীরা আইনি নজরদারির কাজে লাগাতে চাইছে। 'অবৈধ' ধর্মান্তকরণ যারা করবে বা করাবে তাদের 'রাম নাম সত্য হ্যায়' করে দেওয়া হবে—যোগীর এই হুমকিকে সরকারী শিলমোহর দিচ্ছে তার চালু করা অধ্যাদেশ। এটাকে তারা দেখাতে চাইছে 'জেহাদি'দের ষড়যন্ত্রের তৎপর প্রতিরোধ হিসাবে। কার্যত তরুণ প্রজন্মের স্বাধীনতা ও আত্মসম্মানের চেতনার বিরুদ্ধে সঙ্ঘীদের বশংবদ করসেবক তৈরি করার চক্রান্তেরই পরিপূরক এ ধরনের আইনি পদক্ষেপ।

স্পেশাল ম্যারেজ আইন এই অধ্যাদেশের আওতায় পড়ে না, কিন্তু আন্তধর্মের বিবাহমাত্রেই যে এখন থেকে রাষ্ট্র বা হিন্দুত্ববাহিনীর নজরদারির ভয় থাকবে তা অবধারিত। ধর্ম পালন ও ধর্মান্তরকরণ ভারতের সংবিধানে ব্যক্তিগত ব্যাপার। জবরদস্তি ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধেও আইন রয়েছে। ঠিক যেমন ভারতীয় দণ্ডবিধিতে আইন রয়েছে বিবাহোত্তর নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে বা কোনো মেয়েকে ফুসলে এনে তাকে বিপদে ফেলার বিরুদ্ধে। এই আইনগুলি হিন্দু মুসলিম সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আন্তঃধর্ম বিয়ে করতে গিয়ে কোনো মেয়ে এ ধরনের বিপদে পড়লে সে হিন্দুই হোক বা মুসলমানই হোক এই আইনগুলি দিয়েই তার সুরক্ষা সম্ভব। 'লাভ জিহাদি'র প্রচার আমাদের ভুলিয়ে দেয় যে শত শত হিংস্রতার ঘটনা যেখানে রোজ ঘটছে, সেখানে আততায়ীরা আক্রান্তের স্বধর্মেরই লোক। হিংস্রতার প্রতিষেধক আইনগুলিকে কার্যকরী করার বদলে যারা মেয়েদের নিরাপত্তার আইনি পরিকাঠামোগুলিকে বাহুবলীদের স্বার্থে এবং তথাতকথিত 'উঁচুজাতের' স্বার্থে প্রত্যহ পায়ে দলছে, তাদের অধ্যাদেশের আসল লক্ষ্য তো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দানবীকরণ। এই অধ্যাদেশ অন্যভাবেও দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাইছে। মেয়েরা দীর্ঘদিনের সামাজিক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যে সমানতার ও স্বনির্বাচনের অধিকার পেয়েছে তার কোনো মূল্য আর এ দেশে থাকবে না। এই কড়া বার্তাও দিতে চাইছে অধ্যাদেশের কর্তারা। উত্তরপ্রদেশ থেকে রোজই খবর আসছে এ ধরনের নবদম্পতিরা কিভাবে নির্যাতিত হচ্ছেন—তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে কিভাবে ছেলেটিকে জেলে পোরা হচ্ছে এবং মেয়েটিকে আশ্রয় কেন্দ্রে বা সেই পরিবারে যারা মনে করে সে পরিবারকে কলঙ্কিত করেছে। বিশেষত মুসলিম পরিবারগুলিকে নাকাল করার নতুন সুযোগ উত্তরপ্রদেশে তৈরি করেছে এই অধ্যাদেশ।

'লাভ জিহাদ' শব্দবন্ধকে

● সপ্তম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে আন্দোলনরত কৃষকদের পাশে গোটা দেশ

মূর্তি মহা ধুমধাম করে জ্বালিয়ে অশুভ শক্তির বিনাশ করেন। কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর সরকার কৃষি আইন চালু করার ফলে মানুষ এতটাই ক্ষুব্ধ ছিল যে তাঁরা রাবণের মূর্তির বদলে জ্বালালেন খোদ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কুশপুত্তলিকা। তার মানে মানুষের কাছে রাবণের থেকেও বেশি অশুভ হয়ে উঠেছেন নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার। দেশের প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে এর চেয়ে লজ্জাজনক ঘটনা বোধহয় স্বাধীন ভারতবর্ষে আর ঘটেনি।

কেন্দ্রীয় সরকারের জনস্বার্থবিরোধী ও কর্পোরেট তোষণ নীতির বিরুদ্ধে ৭ দফা দাবিতে গত ২৬ নভেম্বর দেশজুড়ে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয় ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, শিল্পভিত্তিক ফেডারেশন এবং কৃষক-খেতমজুরদের কেন্দ্রীয় সংগঠনগুলি। ২৫ কোটি মানুষের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে এই ধর্মঘট সর্বাত্মক চেহারা নেয় এবং পূর্বের ধর্মঘটগুলির থেকে অনেক বেশি সফল হয়।

কৃষক-খেতমজুরদের কেন্দ্রীয় সংগঠনগুলি ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে গ্রাম-ভারত স্তব্ধ করে দেবার যে আহ্বান জানিয়েছিল, দেশের কৃষক সমাজ সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে। শুধু তাই নয়, ধর্মঘটের আগের দিন ২৫ নভেম্বর রাতে পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও রাজস্থানের লক্ষাধিক কৃষক দিল্লি অভিমুখে লং মার্চ শুরু করে। হরিয়ানার বি জে পি-জে জে পি সরকারের পুলিশ পাঞ্জাব-হরিয়ানা সীমান্তে কৃষকদের আটকানোর জন্য পাশবিক দমন-পীড়ন চালায়। অসংখ্য জায়গায় কংক্রিট এবং লোহার ব্যারিকেড গড়ে কৃষকদের আটকানোর চেষ্টা করেছিল পুলিশ। কিন্তু সেসব ব্যারিকেড ভেঙে কৃষকরা এগোতে থাকলে সন্ধ্যায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যেও পুলিশ কৃষকদের ওপর যথেচ্ছভাবে জলকামান ব্যবহার করে। কিন্তু কৃষকরা এতে পিছু না হটে ভিজে অবস্থাতেই পুলিশ হটিয়ে এগোতে থাকেন। দিল্লির কৃষক সমাবেশ বানচাল করার জন্য ২৩ নভেম্বর থেকেই হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের মতো বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে কৃষক নেতাদের বেপরোয়া ধরপাকড় শুরু হয়ে গিয়েছিল। শেষপর্যন্ত বিশাল পুলিশ বাহিনীর সশস্ত্র হামলা, লাঠি, জলকামান, কাঁদানে গ্যাস—কোনো কিছুই দাবিয়ে রাখতে পারলো না লক্ষ লক্ষ প্রতিবাদী কৃষককে। জানকবুল লড়াই চালিয়ে প্রতিবাদী কৃষকের স্রোত দিল্লিতে ঢুকে পড়ল ২৭ নভেম্বর। সরকার দাবি না মানলে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য লরি, ট্রাক ও ট্র্যাক্টরে অন্তত ছ'মাসের খাবার মজুত করে নিয়ে এসেছেন তাঁরা। লক্ষ লক্ষ আন্দোলনকারী কৃষক চারিদিক থেকে রাজধানীকে ঘিরে রাস্তার ওপরেই বসে থাকেন এবং সেই জনসমাবেশ ক্রমশ বাড়তেই থাকে। সেই সমাবেশে মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা কেউই বাদ নেই। কৃষক নেতৃত্ব সরকারের দেওয়া শর্তাধীন আলোচনার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন।

গত ৮ ডিসেম্বর আন্দোলনরত কৃষকরা নয়া কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে ভারত বন্‌ধের ডাক দেন। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে বন্‌ধকে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে যান আপামর ভারতবর্ষের মেহনতী মানুষ। ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও শিল্পভিত্তিক ফেডারেশনগুলি সহ বিভিন্ন গণ সংগঠন ও বিরোধী দলগুলি এই বন্‌ধকে সমর্থন করে। কৃষক-শ্রমিক-মেহনতীর ঐক্যের এক নতুন ইতিহাস রচনা করে কৃষকদের ডাকা এই ধর্মঘট।

সম্প্রতি সাংবাদিক সম্মেলন করে কৃষক নেতৃত্ব জানিয়েছেন যে সরকার দাবি না মানলে ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে রাজধানীর রাস্তায় ট্র্যাক্টর, ট্রলি ও অন্য যানবাহন নিয়ে প্যারেড করবেন কৃষকরা। প্রজাতন্ত্র দিবসের সরকারী অনুষ্ঠানের পরেই এই অভিনব প্যারেড দেখতে পাবেন দেশবাসী। ওই দিন দিল্লির সীমান্তে কৃষকদের শান্তিপূর্ণ অবস্থানের দু'মাস পূর্ণ হবে। সরকারের সঙ্গে কৃষক প্রতিনিধিদের ৩০ ডিসেম্বরের বৈঠকে বিদ্যুৎ বিল আপাতত প্রত্যাহার ও বায়ুদূষণ আইনের আওতা থেকে কৃষকদের বাদ দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেও কৃষকদের মূল দুই দাবি সম্পর্কে অনড়ই থেকে গেছে সরকার। পরবর্তীতে ৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত বৈঠকও নিষ্ফলাই থেকে গেছে। কৃষক সংগঠনগুলি আরও কিছু কর্মসূচী নিয়েছে। ৬ থেকে ২০ জানুয়ারি কৃষকদের দাবি ব্যাখ্যা করে এবং সরকারের অসত্য প্রচারের মুখোশ খুলে দিতে 'দেশ জাগৃতি অভিযান' হবে। মিছিল, ধরণা, সম্মেলন, বিক্ষোভ হবে গোটা দেশজুড়ে। লোহরি / সংক্রান্তি পালিত হবে 'কিসান সঙ্কল্প দিবস' হিসাবে। ওই দিন তিন কালা কানুনের কপি পোড়ানো হবে। ১৮ জানুয়ারি মহিলা কিষাণ দিবসে তুলে ধরা হবে কৃষিতে মহিলাদের ভূমিকার কথা। ২৩ জানুয়ারি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী পালিত হবে আজাদ হিন্দ কিষাণ দিবস হিসেবে। ওই দিন সব রাজ্যের রাজধানীতে রাজ্যপালের সরকারী বাসভবনের বাইরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ হবে। ৬ জানুয়ারি কে এম পি এক্সপ্রেসওয়েতে কৃষকদের মিছিল হবে। ট্র্যাক্টর, ট্রলি নিয়ে সেই মার্চ হবে। শাহজানপুরের অবস্থানকারী কৃষকরা রওনা দেবেন দিল্লির দিকে। এইসব কর্মসূচির শীর্ষে সাধারণতন্ত্র দিবসে রাজধানীতে হবে কৃষক সাধারণতন্ত্র প্যারেড।

এই প্রতিবেদনটি লেখার আগে কৃষক সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বশেষ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় গত ৮ জানুয়ারি। ঐ দিনের আলোচনায় তারা এক নতুন কৌশল গ্রহণ করে ও সরকারের তরফে জানানো হয়, যেহেতু কেউ কেউ এই বিষয়ে ইতোমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে গেছে, তাই আদালতের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে হল। কিন্তু কৃষক প্রতিনিধিরা জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা আদালতে যাননি। এবং এটি সুপ্রিম কোর্টের বিষয় নয়। সরকারের তৈরি আইনকে বাতিল করার দায়িত্বও সরকারের।

কৃষকদের এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের বিশেষত্ব হলো—এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছেন সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। বহু নামজাদা লেখক, শিল্পী, অভিনেতা, খেলোয়াড়, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ অন্নদাতাদের এই আন্দোলনকে ন্যায্য মনে করছেন এবং অনেকেই তাঁদের প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে তাঁদের প্রাপ্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারগুলি ফিরিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সমস্ত বিরোধী দলগুলিও অন্নদাতাদের পাশে সক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়েছে। এই আন্দোলন শাসক জোটেও ভাঙন ধরাতে সক্ষম হয়েছে। আবার বেশ কিছু নেতা শাসক দল থেকে পদত্যাগ করে অন্নদাতাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাই অন্নদাতাদের এই আন্দোলন এক কথায় বলতে গেলে নজিরবিহীন। □

ইন্দ্রজিৎ রায় চৌধুরী

চতুর্থ পৃষ্ঠার পরে

গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ আসলে সরকারের ভয়ের বহিঃপ্রকাশ

সম্প্রচার। এমনটা নয় যে, তাদের হাত বিষয় বস্তু মজুত নেই। দেশের ক্রম ধ্বস্ত আর্থিক পরিস্থিতি, ক্রম বর্ধমান বিশৃঙ্খলা, বেকারি, সাম্প্রদায়িকতা, আর্থিক দুর্নীতি, ভেঙে পড়া বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি অনেক কিছুই রয়েছে তাদের সামনে, কিন্তু সে সব সরিয়ে রেখে এমন বাবে সব কিছু প্রচার বা সম্প্রচার করা হয়, যাতে পাঠক বা দর্শক কোনো সিদ্ধান্তে আসতে সক্ষম না হন—যদিও বা তিনি সিদ্ধান্তে আসেন, তা যেন সরকারের অনুকূলেই হয়। আলোচনা বা প্রশ্ন উত্থাপন করে সরকারকে তার ভূমিকা পরিবর্তন করতে বাধ্য করার যে ভূমিকা অতীতে সংবাদ মাধ্যমের দেখা যেত, তা এখন আর দেখা যায় না। বরং এখন সরকার নিজেই সংবাদ মাধ্যমকে বাধ্য করছে তাদের ভূমিকা পরিবর্তনে।

বস্তুতপক্ষে দেশের সব বড়ো মিডিয়া হাউসই এখন সম্পূর্ণভাবে কর্পোরেটদের দখলে। তারা এগুলিকে দখল করেছে আর্থিক লাভের উদ্দেশ্যে নয়। তারা এগুলিকে দখল করেছে তাদের মতো করে চলতে সরকারকে বাধ্য করতে। আর এখন যেহেতু সরকার নিজেই নিজেকে কর্পোরেটদের হাতে সঁপে দিয়েছে, তখন গুটি কয়েক যে সমস্ত নন-কর্পোরেট মিডিয়া হাউস রয়েছে, তাদের পক্ষে আর মাথা তুলে দাঁড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে জনগণের পক্ষের কথা এখন এ সব মাধ্যমে খোঁজা বাতুলতারই নামান্তর।

গত ২০১৮ সালে লণ্ডনে এক বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর অনন্য ভঙ্গীতে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি বা তাঁর সরকার সবসময়েই সমালোচনাকে স্বাগত জানান কারণ সমালোচনাই সরকারকে সঠিক পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করে ইত্যাদি ইত্যাদি... কিন্তু ফিরে এসে এ ব্যাপারে তাঁর কী ভূমিকা হলো? দেশে কয়েক হাজার সংবাদপত্র এবং কয়েক শ' নিউজ চ্যানেল ছিল এই সেদিন পর্যন্ত। এখন মুষ্টিমেয় কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে বাকি সব ক'টাই হয় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে অথবা নিশ্চিহ্নতার মুখে দাঁড়িয়ে আছে। শুধুমাত্র আর্থিক অনটনই এর একমাত্র কারণ নয়। স্বাধীন ভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে এদের ওপর সরকারের চাপই এর অন্যতম প্রধান কারণ বলে মনে করছে সাংবাদিক মহল। 'দি হিন্দু' পত্রিকার প্রবীণ সাংবাদিক কৃষ্ণ প্রসাদ লিখছেন, "এই মুহূর্তে যোগ্যতাসম্পন্ন সাংবাদিকরা নন, নিউজ চ্যানেলগুলোর মালিকেরাই ঠিক করে দিচ্ছে কী ধরনের খবর প্রচারিত হবে বা কী বিষয়ের উপর বিতর্ক হবে এবং কারা তাতে অংশ নেবে। তাদেরই ঠিক করে দেওয়া পথে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ভয়, ঘৃণা ইত্যাদির বাতাবরণ এবং প্রকারন্তরে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে কাকে সমর্থন করলে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। এক কথায় তাদের পছন্দ মতো জনমত তৈরি করে দিচ্ছে তারাই!" এই কৃষ্ণ প্রসাদ এক সময়ে দেশের অন্যতম নাম করা ইংরাজি সাময়িকী 'আউটলুক' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তথাকথিত 'হিন্দুত্ব'র পক্ষে পত্রিকাটিকে পরিচালনার জন্যে মালিক পক্ষের অস্বাভাবিক চাপের ফলে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি 'আউটলুক' ছেড়ে 'দি হিন্দু'তে যোগ দেন। তাঁর কথায় 'সংবাদ মাধ্যম এখন সরকারের চাপের তলায় হাঁসফাঁস করছে। এমন চাপ ইন্দিরা জমানায় জারি করা কুখ্যাত জরুরি অবস্থার ২১ মাসেও সংবাদ মাধ্যমকে সইতে হয়নি। ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা সংবিধানকে শিকেয় তুলে দিয়ে প্রেসের কণ্ঠরোধ করেছিলেন আর মোদি এখন প্রেসের গোটা কণ্ঠকেই দখল করে নিয়েছেন"।

বস্তুত পক্ষে ২০১৬ সালে লণ্ডনে দাঁড়িয়ে যখন মোদি সমালোচনাকে গণতন্ত্রের 'সৌন্দর্য' বলে ব্যাখ্যা করছেন, তার এক বছর আগে থেকেই সংবাদ মাধ্যমের গলা টেপার কাজ তাঁর শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই বছরেই মোদির অধীনস্থ সংস্থা সি বি আই হঠাৎ করে হানা দেয় প্রখ্যাত সাংবাদিক প্রণয় রায় ও তাঁর স্ত্রী, এন ডি টিভি-র প্রতিষ্ঠাতা রাধিকা রায়ের দপ্তরে ঋণের টাকা তছরূপের অভিযোগ নিয়ে। তাও সেটা নাকি নেওয়া হয়েছিল কোনো সরকারী বা বেসরকারী ব্যাঙ্ক থেকে নয়, কোনো এক ব্যক্তিগত অর্থলগ্নিকারীর কাছ থেকে। যখন একের পর এক তছরূপকারী সরকারী ব্যাঙ্কের টাকা, অর্থাৎ জনগণের টাকা নিয়ে সরকারের নাকের ডগা দিয়ে নির্বিবাদে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারছে, সরকারেরই অনুমোদনক্রমে অন্য দেশের নাগরিকত্ব নিয়ে নিতে পারছে, তখন এক বেসরকারি লগ্নিকারীর টাকা উদ্ধারে দলবল নিয়ে নেমে পড়লো সি বি আই? এরও এক বছর আগে এই এন ডি টিভি-রই হিন্দি অফিসে সি বি আই হানা দিয়েছিল 'দেশদ্রোহীতা'র অভিযোগ নিয়ে। পাঠানকোটে জঙ্গী হামলার পরপরের ঘটনা সেটা। আসলে গল্পটা অন্য জায়গায়। মোদি যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী, সেই ২০০২ সাল থেকেই এন ডি টিভি হাত ধুয়ে তাঁর পেছনে পড়েছিল মুসলিম বিরোধী কাজকারবারের জন্যে (সবারই জানা আছে সে সময়ে গুজরাটে কী ঘটেছিল)। তখন মোদি কিছু করতে পারেননি, শোধ নিলেন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে। শুধু প্রণয়-রাধিকাই নন, সরকারের রোষে ওই বছর এবং পরের বছরেই পড়েছেন সরকারের সমালোচনাকারী আর এক সংবাদ সংস্থার মালিক রাঘব বহেলও। তাঁর বিরুদ্ধে আনা হয়েছিল কর ফাঁকি দেওয়া এবং বে-আইনি অর্থ পাচারের অভিযোগ। বার্তা স্পষ্ট—হয় সরকারের পক্ষ থেকে বলো, নয় টিপে মেরে ফেলা হবে তোমাদের। দুই সংস্থাই সরকারের কাছ থেকে কোনো বিজ্ঞাপন পায় না, কোনো এক 'অজানা কারণে' দুই সংস্থা থেকেই হাত তুলে নিয়েছে এক বড়ো অংশের বেসরকারী বিজ্ঞাপনদাতাও।

পার পাননি করণ থাপারের মতো সাংবাদিকও। ২০০২ সালে গুজরাট গণহত্যাকাণ্ডের পর থাপার মোদিকে কড়া প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছিলেন এক সাক্ষাৎকারের সময়ে, প্রতিদান পেয়েছেন মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে ২০১৭ সালে। 'কোনো এক অজানা কারণে' ঐ বছর 'ইন্ডিয়া টুডে টিভি' তাঁর চুক্তি পুনর্নবীকরণে অস্বীকার করে। কয়েক মাস পরেই 'হিন্দুস্তান টাইমস'এর সম্পাদক ববি ঘোষও একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। খবর বলছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে এক সাক্ষাতের পরেই টাইমস মালিক এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এর আগে ঘোষ মোদি ঘণিষ্ঠ এক দাঙ্গাকারীর স্বরূপ উন্মোচনের 'ভুল' করেছিলেন। তার মানে লণ্ডনে দেওয়া মোদির বক্তৃতা ছিল আসলে এক নাটক, এক তঞ্চকতা—বাইরে একরকম কথা বলা, ভিতরে করা তার ঠিক উল্টো কাজ। অবশ্য এই জামানায় এই ধরনের তঞ্চকতার উদাহরণ আছে ভুরিভুরি। এ প্রসঙ্গে আর একজনের নাম না করা অন্যায় হবে—তিনি রাজীব চন্দ্রশেখর। ভদ্রলোক আসলে একজন অর্থলগ্নীকারী। কিছুদিন আগে তিনি একটি নিউজ চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করেন শুধুমাত্র মোদির প্রচারের উদ্দেশ্যে। চ্যানেলটির নাম 'রিপাবলিক টিভি' আর এর প্রধান সাংবাদিকের নাম অর্ণব গোস্বামী। সাংবাদিক অর্ণবের 'সাংবাদিকতা'র নমুণা আমরা সবাই জানি, তার এখনকার পরিণতিও আমরা সবাই জানি, কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না, সেটা হলো ঐ চ্যানেল প্রতিষ্ঠার কয়েক দিনের মধ্যেই চন্দ্রশেখরকে ভারতীয় জনতা পার্টি রাজ্যসভার মনোনীত সদস্য হিসেবে শপথ বাক্য পাঠ করিয়েছিল।

সংবাদ মাধ্যমের পরিস্থিতি নিয়ে এতগুলো কথা বললাম এই কারণে যে গণতন্ত্রের চার স্তম্ভের মধ্যে এই স্তম্ভটাই মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল এবং সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারতো, কিন্তু এখন সেটাও আর রইলো না। দেশের আইন সভায় এখন গণতন্ত্রের কোনো স্থান নেই—বিরোধীরা সেখানে কথা বলতে পারেন না—এমনকি ইদানিং সেখান থেকে প্রশ্নোত্তর পর্বও উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিনা আলোচনায় বিল পাশ হয় সেখানে। আমলাতন্ত্র পুরোপুরি সরকারের কব্জায়, সরকারের কথায় ওঠবোস করতে বাধ্য সে। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে বিচার ব্যবস্থাকেও খুব সহজেই প্রভাবিত করে ফেলা যাচ্ছে, যা অন্যান্য দেশে কল্পনাও করা যায় না। এখানে বিচারক সরকারের পক্ষে রায় দেওয়ার পর সাবলিল ভাবে রাজ্যসভার সদস্য হয়ে যেতে পারেন, নিজের বিরুদ্ধে ওঠা যৌন কেলেঙ্কারির বিচার নিজেই করতে পারেন—সহ-বিচারকেরা তাতে বিন্দুমাত্র বাধা দেন না। বিচার ব্যবস্থার মূল কথা 'nemo judex in causa sua' অর্থাৎ 'কেউই নিজের বিচার নিজে করতে পারেন না' এখানে লঙ্ঘিত হয় অবলীলায়, তাহলে তার ওপরে কী করে ভরসা রাখবেন সাধারণ মানুষ? এমতাবস্থায় যে সংবাদ মাধ্যম তার পাশে দাঁড়াতে পারতো, তাকেও আজ দখল ফেলা হয়েছে। মারতে মারতে তাকে এমন জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে যে 'ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম এক্সপ্রেস'-এর সূচকে তার স্থান এখন ১৪০ নম্বরে। সত্যিই এক ভয়াবহ পরিস্থিতি এখন ভারতে বিরাজ করছে, যেখানে গণতন্ত্রের চারটে স্তম্ভই ধ্বংসপ্রাপ্ত।

কিন্তু কেত এতো আয়োজন? কেন গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করার এই প্রবণতা? এটা ঠিক যে সব জায়গাতেই শুধু প্রশাসন মানুষের কণ্ঠরোধ করতে চাইছে এমনটা নয়, অনেক জায়গাতেই রাজনৈতিক গুণ্ডাগিরি মানুষের গলা টিপে দেওয়ার জায়গায় চলে যাচ্ছে। ঠিক মতো হিসেব করলে দেখা যাবে, যে সব জায়গায় ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার রয়েছে, বা যে সমস্ত জায়গায় তাদের সাংগঠনিক ক্ষমতা বেশি, সেই সমস্ত জায়গাতেই মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে গায়ের জোরে দাবিয়ে দেওয়ার ঘটনা বেশি। কিন্তু কেন এমন—প্রশ্ন এইখানটাতেই!

এর উত্তর লুকিয়ে আছে অন্য জায়গায়। সংবিধান দেশের সরকারের ওপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে, তার প্রতিটা ক্ষেত্রেই নরেন্দ্র মোদির সরকার চরম ব্যর্থ। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ যতই বাগাড়ম্বর করুন না কেন, যতই ঈশ্বরের দোহাই দিন না কেন, দেশের অর্থনীতি তলানীতে নামতে নামতে এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছে যে কয়েকদিনের মধ্যেই সে বাংলাদেশেরও তলায় নেমে যাবে। দারিদ্র্যের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়ছে, বেকারি এক চরম জায়গায় পৌঁছেছে, প্রতিবেশী সমস্ত দেশের সাথেই এখন ভারতের বিবাদের সম্পর্ক। যে তিনটে কৃষি বিল বিনা আলোচনায় সংসদে পাশ করিয়ে নেওয়া হয়েছে, তাকে কেন্দ্র করে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এখন ফুটছে। এমতাবস্থায় যদি মানুষের কথা বলার অধিকার অটুট থাকে, তাহলে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়বে অচিরেই আর তাই সরকার, আরও ভালো ভাবে বলতে গেলে বি জে পি সরকার যে কোনো প্রতিবাদীর গলা টিপে ধরতে মরিয়া, যে কোনো উপায়ে মানুষের নজর ঘুরিয়ে দিতে মরিয়া। হিন্দুত্ব বলুন কিম্বা লাভ জিহাদ, মুসলমান নিগ্রহ বলুন কিম্বা দলিত হত্যা—সমস্তই আসলে মানুষকে অন্যদিকে ব্যস্ত রাখার ঘৃণ্য এবং পরিচিত কৌশল। কিন্তু এর ফলে যেটা কায়েম হয়ে যাচ্ছে ভারতবর্ষে, তা আসলে ফ্যাসিবাদ। ফ্যাসিবাদ মানে এক উগ্র জাত্যাভিমান মানুষের মধ্যে জারিত করা, ফ্যাসিবাদ মানে অন্য সবার গলা টিপে দিয়ে শুধু নিজের গলাকে তুলে ধরার ব্যবস্থা করা, ফ্যাসিবাদ মানে নির্মমতাকে প্রশ্রয় দিয়ে জাগতিক যাবতীয় লালিত্যকে নিশ্চিহ্ন

● সপ্তম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

পঞ্চম পৃষ্ঠার পরে

অতীতের দর্পণে বর্তমানকে না দেখতে পারলেই বিপদ

কারোর সমালোচনাতেই তিনি রাজি ছিলেন না।

গুজরাটে বিধানসভা নির্বাচনে জিতে দাঙ্গার রক্তে হাত রাঙানো মোদী সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানো নির্বাচনী প্রচারকে হাতিয়ার করে ২০০২ সালের ২২ ডিসেম্বর পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হন। নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী মোদীকে ফুলের তোড়া পাঠিয়ে সে সময় অভিনন্দন জানিয়েছিলেন মমতা ব্যানার্জী।

এর প্রতিদান দিয়েছিল আর এস এস। সেই সময় মমতা ব্যানার্জী এন ডি এ মন্ত্রিসভায় ছিলেন না। কেন ছিলেন না? ২০০১ সালের মে মাসে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে ক্ষমতা দখলের নতুন অঙ্কে ১৫ মার্চ বাজপেয়ী মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন মমতা ব্যানার্জী। কিন্তু এন ডি এ জোট ছাড়েননি তিনি। সেই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস দলের সঙ্গে জোট বাঁধেন। যদিও কলকাতা কর্পোরেশন সহ রাজ্যের অন্যান্য পৌরসভায় এবং পঞ্চায়েতে তৃণমূল-বি জে পি জোট বহাল ছিল যথারীতি। সেই বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবি হয় তৃণমূল-কংগ্রেস জোটের। ষষ্ঠ বামফ্রন্ট সরকার বিপুল গরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসে। ২০০১ সালের ২৪ আগস্ট বি বি সি-র ''হার্ড টক ইন্ডিয়া' অনুষ্ঠানে করণ থাপারের নেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মমতা ব্যানার্জী স্পষ্ট করে বলেন, ''বি জে পি আমাদের স্বাভাবিক মিত্র...।''অতঃপর ২০০১ সালের ২৭ আগস্ট মমতা ব্যানার্জী ফের বি জে পি জোটে যোগ দেন। অবশেষে গুজরাট দাঙ্গা এবং তার পরবর্তী সময়ে তাঁর ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৩ সালের ৮ সেপ্টেম্বর বাজপেয়ী আবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করেন মমতা ব্যানার্জীকে। যদিও দপ্তর দেওয়া হয়নি দীর্ঘদিন। দপ্তরবিহীন মন্ত্রী—তাই সই, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য তো হওয়া গেল। ২০০৪ সালের ৯ জানুয়ারি কয়লা ও খনি মন্ত্রক দেওয়া হয় তাঁকে। বাজপেয়ী সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত সেই পদে ছিলেন। সেই সময়ে রাজ্যজুড়ে যাবতীয় নৈরাজ্যবাদী কাজকে রাষ্ট্রীয় মদত দিয়ে গেছে বাজপেয়ী সরকার।

'দুর্গা' চিনেছে 'দেশপ্রেমিক' ঃ ২০০৩ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লীতে আর এস এস-এর মুখপত্র 'পাঞ্চজন্য'-র সম্পাদক তরুণ বিজয় সম্পাদিত 'কমিউনিস্ট টেররিজম' নামে পুস্তক প্রকাশ অনুষ্ঠানে মমতা ব্যানার্জী এই রাজ্য থেকে বামফ্রন্ট সরকারকে হটাতে আর এস এস-এর সাহায্য চান। তিনি বলেছিলেন— ''কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমি আপনাদের পাশে আছি। যদি আপনারা আমায় এক শতাংশ সাহায্য করেন, আমরা কমিউনিস্টদের সরাতে পারবো।'' তাঁর এই বক্তব্যে বলাই বাহুল্য উৎসাহিত হয় আর এস এস। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোহন ভাগবত, মদন দাস দেবী, এইচ ভি শেষাদ্রির মতো কট্টর হিন্দুত্ববাদী শীর্ষনেতারা। তাঁদের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠানে মমতা বলেন, ''... আপনারা সত্যিকারের দেশপ্রেমিক। আমি জানি আপনারা দেশকে ভালোবাসেন...''। বি জে পি-র রাজ্যসভার সাংসদ বলবীর পুঞ্জ ওই সভাতেই বলেন, ''আমাদের প্রিয় মমতাদি সাক্ষাৎ দুর্গা''। (সূত্র ঃ দ্য টেলিগ্রাফ, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৩)

২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত আর এস এস-র শাখার সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনার সাথে উপরোক্ত ঘটনাবলীর অভিজ্ঞতাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আর এস এস পরিচালিত রাজনৈতিক দল বি জে পি-র বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের আদর্শগত কোনো লড়াই নেই, আছে শুধু স্বার্থের সম্পর্ক অথবা স্বার্থজনিত বিবাদ বা নকল বিবাদ। আদর্শগত কোনো লড়াই নেই বলেই বর্তমানে দল বদলের চলমান কুনাট্য আমরা প্রত্যক্ষ করছি। গণমাধ্যম সমস্ত বিষয়কে গুলিয়ে দিয়ে তৃণমূল-বি জে পি তরজা উপস্থাপন করছে। মানুষ সবই দেখছেন। করোনাকালে এবং তার আগে পিছে কারা মানুষের পাশে মানুষের দাবি নিয়ে রাস্তায় থেকেছে মানুষ তাও দেখেছে। তবু জনগণকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা কিছুটা সফলতা হয়তো পেয়ে যায়। কারণ অতীতের দর্পণে বর্তমানকে যাচাই করার সদিচ্ছা মিডিয়ার নেই, দক্ষিণপন্থী দলগুলির তো নেই-ই। তাই খুব বেশি দিন পুরানো নয় এমন কিছু বাস্তব ঘটনার উল্লেখ এখানে করা হলো। শাসক বরাবরই আমাদের স্মৃতিশক্তির দুর্বলতাকে হাতিয়ার করে। আমাদের তাই স্মৃতিশক্তি জাগ্রত রেখে কোনো রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের ক্ষেত্রে একটি সমসাময়িক প্রসঙ্গে তার অতীত ও বর্তমান অবস্থানকে মিলিয়ে প্রকৃত সত্যের মুখোমুখি হতে হবে। তাহলেই বোঝা সহজ হবে আদতে মিডিয়ার তৈরি এপক্ষ-ওপক্ষের মধ্যে কোনো নীতিগত ফারাক নেই। □

তৃতীয় পৃষ্ঠার পরে

চিন্তায় ও কর্মে রেনেসাঁর প্রতিনিধি

তাঁর। অভিনেতা কি একজন কলাকুশলী মাত্র, যার ব্যক্তিগত জীবনদৃষ্টি বা রাজনীতি নিজের কাজের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন? এই প্রশ্ন তিনি উত্থাপন করেছিলেন ঋত্বিক ঘটক স্মৃতি বক্তৃতায়। 'অভিনয় ও রাজীনতি' প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, ব্যক্তি অভিনেতার রাজনৈতিক চেতনা যত উঁচু স্তরের হোক না কেন তার অভিনয় ক্ষমতা পণ্য উৎপাদন ছাড়া অন্য কাজে বড় একটা আসে না। এমনকি তার কাজ দেশবাসীকে অনগ্রসর করে রাখার কাজে ব্যবহার হয়। তাঁর মত ছিল, ''এইসব শৌখিন মজদুরির দিকে তাকিয়ে মনে হয় যেন যেদিন অভিনেতা দেশের বেশির ভাগ মানুষের মাঝ থেকে তাঁদের জীবনের কথা মঞ্চে, ক্যামেরার সামনে তুলে আনবেন, সেই দিনই সত্যিকারের জীবননিষ্ঠ অভিনয় সম্ভব হবে। তার আগে অভিনয়ের মুক্তি নেই।''

যুবক বয়স থেকে বামপন্থী আন্দোলনের মধ্যে থাকার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি স্থির করেছিলেন নন্দীগ্রামের ঘটনার সময়ে কী অবস্থান নেবেন। ২০০৬ সালের ১৪ মার্চ নন্দীগ্রামে পুলিশের গুলিতে ১৬ জনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সুশীল সমাজ বামফ্রন্ট সরকারকে যখন আক্রমণ করছে, বামফ্রন্টের বহু চেনা বন্ধু সরে যাচ্ছেন, তখনও যারা পুলিশের গুলি চালনায় সাধারণ মানুষের মৃত্যুতে প্রতিবাদ জানিয়ে তদন্ত চেয়েও বামপন্থীদের ওপর আস্থা রেখেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এজন্য সরকারবিরোধী বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে চিঠি মারফৎ তাঁর কাছে অভিযোগ ও কুৎসা করা হয়। তার উত্তর তিনি দিয়েছিলেন, প্রকাশ্যে, যেখানে তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন, তিনি পুলিশের গুলি চালনার বিরোধী হলেও এবং সরকার এই মৃত্যু এড়াতে ব্যবস্থা নিতে পারত মনে করলেও নন্দীগ্রামের তথাকথিত আন্দোলনের সম্পর্কে তাঁর কেন সংশয় রয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল বলে যাদের সারা জীবন চিনে এসেছেন, তাদের সঙ্গে এক জায়গায় দাঁড়াতে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। দ্বিধাহীনভাবে বলেছিলেন, ''দক্ষিণপন্থী মঞ্চে দাঁড়াইনি, দাঁড়াব না।''

দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে মৃত্যুর এক মাস আগে গণশক্তি শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর অনুলিখিত বক্তব্য---''এখনও বিশ্বাস করি, বামপন্থাই বিকল্প''। রাম-রহিমের বিভেদের রাজনীতি তাঁর দেশকে এক অচেনা অন্ধকারে নিয়ে যাচ্ছে যেখান থেকে চেনা ছন্দে ফেরাবার লড়াইটা করবে একমাত্র বামপন্থীরাই। চিরবিদায়ের আগে এই প্রত্যয় তিনি ঘোষণা করে গেলেন। আমাদের বলে গেলেন এই লড়াইটা আমাদেরই করতে হবে, এ লড়াই বাঁচার লড়াই। তাই তাঁর মৃত্যুতে ''শুধু শোক নয়, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ উদয়ন পণ্ডিতের লড়াইকে মনে রাখবে আর উজ্জীবিত হয়ে পথে নেমে বলবে, ''দড়ি ধরে মারো টান...'' □

পঞ্চম পৃষ্ঠার পরে

LOVE হীন জিহাদ

সামনে রেখে আর এস এস-বি জে পি যখন তাদের সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতিকে তীব্র করার চেষ্টা করছে ঠিক তখনই দুটি ভিন্ন মামলায় দিল্লি ও এলাহাবাদ হাইকোর্ট স্পষ্ট করে দিয়েছে কে কার সঙ্গে থাকবে বা কে কাকে বিয়ে করবে সে সম্পর্কে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার প্রাপ্ত বয়স্কদের আছে। এক্ষেত্রে পরিবার, রাষ্ট্র বা আদালতের বাধা দেবার কোনো অধিকার নেই। একজন প্রাপ্তবয়স্ককে নিজের সঙ্গী বেছে নেবার অধিকার দেশের আইন ও সংবিধান দিয়েছে। আদালতের দায়িত্ব মানুষের সেই অধিকার সুরক্ষিত করা।

হিন্দুত্ববাদী বি জে পি যে সংবিধান মানে না, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে মানুষকে তাদের হুকুমের অনুগত করে রাখতে চায় 'লাভ জিহাদ' তারই জ্বলন্ত উদাহরণ। এরা প্রচার করে 'লাভ জিহাদ' মুসলিমদের একটি ষড়যন্ত্রমূলক কৌশল। মুসলিম যুবকরা হিন্দু মেয়েদের ফুসলিয়ে বিয়ে করে ধর্মান্তরিত করছে মুসলিম জনসংখ্যা বাড়ানোর জন্য। তাই মুসলিম পরিবারে হিন্দু মেয়ে বিয়ে আইন করে তারা নিষিদ্ধ করতে চান। কিন্তু তাদের হিন্দু পরিবারে মুসলিম মেয়ের বিয়েতে আপত্তি নেই। কারণ এদের সন্তানরা হিন্দুর সংখ্যা বাড়াবে। অর্থাৎ লাভ জিহাদ মুসলিমদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হিন্দুদের ক্ষেত্রে নয়। ভারতের সংবিধান এমন বিভাজন বৈষম্য মান্যতা দেয় না।

ভারতে ১৩০ কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র ১৩ শতাংশ মুসলিম। বছরে ক'জন হিন্দু মেয়ে মুসলিমকে বিয়ে করে তার পরিসংখ্যান হিসাবের মধ্যেই আসে না। তাই এইভাবে মুসলিম সংখ্যা বৃদ্ধির তত্ত্ব বাটি নিয়ে সমুদ্রের জল মাপা ছাড়া আর কিছুই নয়। হিন্দুত্ববাদীদের অভিযোগ জোর করে নাকি এই বিয়ে হচ্ছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত এ সংক্রান্ত যতগুলি মামলা হয়েছে সবক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে স্বেচ্ছায় ভালোবেসে বিয়ে হয়েছে। যুক্তিতে, পরিসংখ্যানে, আইনে নিজেদের অবস্থানকে দাঁড় করতে না পেরে তারা ভিন্ন ধর্মের বিয়েকে কেন্দ্র করে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে বিভাজন করে ভোটে ফায়দা লুটতে চাইছে। লক্ষণীয় বাজপেয়ী, আদবানি, মুরলী মনোহর যোশী থেকে শুরু করে মোহন ভাগবতের পরিবারেও ভিন্ন ধর্মে বিবাহ হয়েছে। সঙ্ঘ পরিবারের মধ্যেই এমন ডজন ডজন উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। নেতা, মন্ত্রী, বিত্তবান ও প্রভাবশালীদের ক্ষেত্রে ভিন্ন ধর্মে বিবাহ নিয়ে যোগীরা নীরব। তাদের লক্ষ্য গরিব ও দলিতদের আক্রমণ করে ত্রাস সৃষ্টি করা, যাতে নিচু তলায় বিভাজন ঘটে তাদের ভোট ব্যাঙ্ক বৃদ্ধি পায়। যোগী সরকারের পথেই পা বাড়িয়েছে হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক ও আসাম সহ কিছু বি জে পি শাসিত রাজ্য।

আমাদের দেশে যে কোনো প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ যে কোনো সময়ে ধর্ম পরিবর্তন করতে পারেন। আইন ব্যক্তিগত পরিসর, ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে সম্মান দিয়েছে। তাহলে কে কোন ধর্ম নেবেন তাতে কেন রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে? আর বিয়ে করতে হলে কেন ধর্ম পরিবর্তনের দাবি উঠবে, আর মেয়েরাই বা কেন সবসময় ধর্ম পরিবর্তন করবেন সে প্রশ্নও ওঠা দরকার। আশা রাখি এই আইন বা অধ্যাদেশগুলি সংবিধানের নিরিখে বাতিল হবেই। সেখানে ব্যক্তির নির্বাচনের অধিকার, তার গোপনীয়তার অধিকার, জীবন জীবিকার অধিকারের মতোই অলঙ্ঘনীয়, অবিচ্ছেদ্য—এই কথাটাই দেশজুড়ে অনুরণিত হবে। তবে নিকিতা তোমর-তৌসিফ বা শুভলগ্না চক্রবর্তী-সুলতান—যেখানে সম্পর্কে আপত্তি মেয়েটিকে বেঁচে থাকার গণতান্ত্রিক পরিসর দেয়নি, সেগুলো নিশ্চয়ই মানুষ মনে রাখবে। □

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পরে

গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ আসলে সরকারের ভয়ের বহিঃপ্রকাশ

করে দেওয়া। শুধু দেশের সরকারই যে এমনটা করছে তা নয়, বি জে পি পরিচালিত সমস্ত সরকারই এই পথের শরিক কারণ তাদের সবারই মতাদর্শের টিকি একই জায়গায় বাঁধা, তারা নিয়ন্ত্রিত সবাই একই জায়গা থেকে আর সেই জায়গার ঠিকানা নাগপুর, নিয়ন্ত্রকের নাম আর এস এস।

প্রশ্ন উঠতেই পারে যে মোদি সরকারই তো দেশে প্রথম বি জে পি পরিচালিত একমাত্র সরকার নয়, এর আগেও তো এমনই বি জে পি পরিচালিত সরকার দেখেছে মানুষ। তখন তো এই পর্যায়ের উগ্রতা চোখে পড়েনি। তাহলে এখন এমন হচ্ছে কেন? হচ্ছে মূলতঃ দুটি কারণে—এক, এখনকার মতো আগা থেকে ল্যাজা পর্যন্ত এতো অপদার্থের ভিড় ছিল না আগের বি জে পি সরকারগুলিতে, রাজনীতিতে কিছু হলেও সে সরকারগুলোর মন্ত্রীদের অবদান ছিল, ফলে কিছুটা হলেও তাদের চোখের চামড়া ছিল আর দুই, এখনকার মতো তখনকার সরকারগুলিতে বি জে পি-র এমন নিরঙ্কুশ একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা ছিল না, অন্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল তারা, ফলে ইচ্ছে থাকলেও দাঁত নখ খুব বেশি বের তারা করতে পারেনি—ভিতরে আর এস এস-কে পুষলেও ওপরে ভদ্রতার প্রলেপ তাদের রাখতেই হয়েছিল।

কিন্তু এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সরকারে এখন বি জে পি-র নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা এবং সে গরিষ্ঠতাও অর্জিত হয়েছে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে নয়, সম্পূর্ণভাবে কর্পোরেট জগতের মদতে এবং ব্যবস্থাপনায়। এমনিতেই শ্রেণি চরিত্রে জন্মলগ্ন থেকেই আর এস এস বণিকের মুৎসুদ্দি। এই মুৎসুদ্দিগিরি করতে গিয়েই স্বাধীনতার আগে তারা এমন কোনো কর্মসূচী নেয়নি, যাতে বণিক ইংরেজ কোনোরকম বিপদে পড়ে। কথায় কথায় ইংরেজদের কাছে মুচলেকা দেওয়া আর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা তাদের ইতিহাসের ছত্রে ছত্রে। সেই উত্তরাধিকার তারা এখনও বহন করে চলেছে আর আজ তাই যেহেতু সংসদে তাদের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ, নির্দ্বিধায় তারা তাই বণিকের সেবা করে ধন্য হচ্ছে। সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে এই করোনাকালে দেশে মোদি সরকার বা রাজ্যে রাজ্যে বি জে পি সরকারগুলোর কাছ থেকে সাধারণ মানুষ পরিষেবা না পেলেও কর্পোরেট জগৎ তার 'পরিষেবা' ঠিকই পেয়ে গেছে। দেশের একের পর এক মহামূল্যবান সম্পদ তারা হাতে পেয়েছে এই সময়কালের মধ্যেও। দেশে একের পর এক নীতি তৈরি হয়েছে এই সাঙ্ঘাতিক সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়েও, যাতে কর্পোরেট জগতের কোনো অসুবিধা না হয়, তাদের মুনাফার পরিমাণ যেন বাড়তেই থাকে। রিপোর্ট বলছে এই সময়ে দেশের তিন শীর্ষ শিল্পপতি গড়ে প্রতি ঘণ্টায় তিরিশ কোটি টাকা করে মুনাফা করে গেছে যা সর্বকালীন রেকর্ড এবং তা হতে পেরেছে সরকারেরই মদতে। লকডাউনের ফলে ঘরে বসে থাকতে বাধ্য হওয়া রোজগার বিহীন মানুষ এই সময়ে খাওয়ার টাকা যোগাড় করতে না পারলেও এবং জিনিসের দাম ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী হতে থাকলেও এই সময়েই, হ্যাঁ এই সময়েই সরকার সমস্ত রকম খাদ্যশস্যের মজুতের ঊর্ধ্বসীমা উঠিয়ে দিয়েছে কর্পোরেট জগৎকেই সুবিধে করে দেওয়ার জন্যে। এ কাজ তাদের আগামী দিনেও চালিয়ে যেতে হবে এবং সে কাজে যাতে কোনোরকম বাধা না আসে, সেবা করতে গিয়ে মানুষের বিদ্রোহের 'ভয়' যাতে তাদের বিন্দুমাত্র না থাকে, তার জন্যেই এতো আয়োজন, তার জন্যেই ফ্যাসিবাদ কায়েম।

তাহলে মূল কথা হলো 'ভয়'। ভয় থেকেই মানুষকে ভয় দেখানো, ভয় থেকেই গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ, ভয় থেকেই ফ্যাসিবাদ কায়েম। পাঠক, এতক্ষণ লেখাটা ধৈর্য ধরে পড়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। এতক্ষণে আপনাকে বোধহয় কিছুটা হলেও বোঝাতে পেরেছি যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক দিক দিয়ে ব্যর্থ মোদি সরকার আসলে ব্যঘ্রচর্মধারী শৃগাল, বহুজাতিক পুঁজির এক এজেন্ট মাত্র। আশা করি এটাও আপনি বুঝতে পেরেছেন যে আর এস এস-বি জে পি-র তথাকথিত সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ বাস্তবে একটি ভাঁওতা—মানুষের সামনে পরদা ধরার এক কৌশল। এর থেকে আপনার এমন ধারণা জন্মানো স্বাভাবিক যে এইভাবে নরেন্দ্র মোদির সরকারকে যদি নির্বিবাদে কর্পোরেটের সেবা করতে দেওয়া যায় তাহলে অচিরেই দীর্ঘ লড়াইয়ে অর্জিত ভারতীয় গণতন্ত্রের আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকবে না। এমন সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই আপনার মধ্যে ইতোমধ্যেই জন্ম নিতে শুরু করে দিয়েছে যে আগামী দিনে এই সরকার এবং তার প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য সমস্ত শক্তিকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখা শুধু নয়, তাদের দুর্বল করে দেওয়াই আপনার কর্তব্য হবে। দেশের সরকার এবং তার পরিচালিকা শক্তির এতো অত্যাচারের মধ্যেও যেভাবে দিকে দিকে বিদ্রোহের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলে উঠছে, তার থেকে আপনার মধ্যে আগামীর সঙ্কল্প তৈরি হয়ে যাওয়া উচিৎ। কিন্তু তা যদি না হয়?

"তা যদি না হয় বুঝবো তুমি মানুষ নও—
গোপনে গোপনে দেশদ্রোহীর পতাকা বও।
ভারতবর্ষ মাটি দেয়নিকো, দেয়নি জল,
দেয়নি তোমার মুখেতে অন্ন, বাহুতে বল।
পূর্বপুরুষ অনুপস্থিত রক্তে তাই—
ভারতবর্ষে আজকে তোমার নেইকো ঠাঁই।।'' □

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR
State Co-ordination Committee
48th Year, 7th Special E-Edition, December 2020
Regd. No. : 18484/71

রাজ্যজুড়ে সংগঠনের জনমুখীন তৎপরতা

বীরভূমে শীতবস্ত্র বিতরণ

দক্ষিণ ২৪ পরগণার শীত বস্ত্র বিতরণ

জলপাইগুড়ি জেলায় কম্বল বিতরণ

কোচবিহারে রক্তদান কর্মসূচী

দেশের প্রধানমন্ত্রীর নাটকীয় ঢঙে, হঠাৎ ঘোষণা করা লকডাউনের ফলে দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনে ঘোর বিপর্যয় নেমে আসে। রোজগারহীন এই অংশের মানুষের কাছে, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের থেকেও, অন্ন সংস্থানের বিষয়টি বড় হয়ে ওঠে। জুন, ২০২০ থেকে ধীরে ধীরে 'আনলক' প্রক্রিয়া শুরু হলেও, এদের একটা বড় অংশই হারানো কাজ ফিরে পায়নি। বা কোনোরকমে কাজের সংস্থান হলেও, মজুরি হ্রাস পায় বা অনিয়মিত হয়ে পড়ে।

এই পরিস্থিতিতে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সর্বতো উদ্যোগ গ্রহণ করে এই রাজ্যের বামপন্থী সংগঠন সমূহ। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি এই উদ্যোগে শামিল হয় প্রথম থেকেই। প্রান্তিক মানুষের কাছে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার মধ্য দিয়ে শুরু হয় জনমুখীন উদ্যোগ। পরবর্তী পর্বে রান্না করা খাবার পরিবেশন, করোনা প্রতিরোধ প্রয়োজনীয় মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণ, বালক-বালিকা ও কিশোর-কিশোরীদের হাতে শিক্ষা সামগ্রী তুলে দেওয়া, শারদোৎসবের সময় নতুন জামা-কাপড় পৌঁছে দেওয়া এবং ঠাণ্ডার সময় শীত বস্ত্র বিতরণের কাজ করা হচ্ছে রাজ্যজুড়েই। সর্বোপরি সংগঠিত হচ্ছে রক্তদান কর্মসূচী। কেন্দ্রীয়ভাবে এবং সংগঠনের প্রতিটি জেলা কমিটি উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করে এই কাজ করে চলেছে। এই সামগ্রিক জনমুখীন কর্মকাণ্ডে মূল ভূমিকা অবশ্যই কর্মচারী বন্ধুদের। কারণ তাঁদের আর্থিক সহায়তায় বলীয়ান হয়েই এত বড় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে। সর্বোপরি আন্দোলন সংগ্রামের পাশাপাশি জনমুখীন কর্মকাণ্ড নতুন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করছে কর্মী-সংগঠকদের। □

দক্ষিণ কলকাতায় পেনশনার্স সমিতির বিক্ষোভ সভায় যুগ্ম সম্পাদক

নদীয়া জেলায় শীতবস্ত্র বিতড়ণ কর্মসূচীতে সাধারণ সম্পাদক

বাঁকুড়ায় সংগঠনের গ্রন্থাগার উদ্বোধন

উত্তর দিনাজপুর জেলায় ত্রাণ বণ্টন

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত।